NOTICE

Students, both men and women, and members of the staff of Asutosh College are hereby invited to contribute to the College Patrika. *Short and precise articls, stories, poems etc. written with a fair spirit of originality on subjects of general interest will be welcomed.* Ex-students are also eligible for contribution to our College Patrika. Sketches, portraits, cartoons etc. must be drawn in China ink.

All writings for publication must be written, if possible type-written, on one side of fool-scap size paper and should be accompanied by the full name and address of the writer, *not necessarily for publication but as a gurantee of good faith.* Rejected writings cannot be returned.

Contributions should be addressed to the Professor-in-charge of the College Patrika.

ASUTOSH COLLEGE PATRIKA

Vol. XXI || DECEMBER, 1946 || No. I

PROFESSOR-IN-CHARGE :
SHRI AMIYARATAN MUKHOPADHYAY, M.A.
Puran-ratna, Sahitya-Visarad

আশুতোষ কলেজ পত্রিকা

একবিংশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা

ডিসেম্বর : ১৯৪৬

::: সম্পাদক-সঙ্ঘ :::

শ্রীঅরুণকুমার দত্তগুপ্ত

শ্রীসংযুক্তা কর

শ্রীসেমন্তী চক্রবর্তী

শ্রীনরেশচন্দ্র ঘোষ

শ্রীসুহাসকুমার রায়

শ্রীরামপ্রসাদ চক্রবর্তী

শ্রীঅমল চক্রবর্তী

::: সঙ্ঘ-প্রধান :::

শ্রীপীযূষকান্তি চট্টোপাধ্যায়

'দূর যুগান্তর হতে
মহাকাল-যাত্রী মহাবাণী পুণ্য মুহূর্তের তব
শুভক্ষণে দিয়েছে সম্মান; তোমার সম্মুখ দিকে
আত্মার যাত্রার পন্থ গেছে চলি অনন্তের পানে
সেথা তুমি একা যাত্রী, অফুরন্ত এ মহাবিস্ময়।'

—রবীন্দ্রনাথ

504

সূচীপত্র

	বিষয়	পত্রাঙ্ক
১।	সম্পাদকীয়	১
২।	বাঙ্‌লা সাহিত্য সমিতি (কার্য-বিবরণী)	৮
৩।	আশুতোষ কলেজ ছাত্রাবাস (কার্য-বিবরণী)	১১
৪।	ছাত্রবন্ধু স্যার আশুতোষ (স্মৃতিকথা)—বিচারপতি শ্রীসুধীরঞ্জন দাস	১২
৫।	রবীন্দ্র-সাহিত্যে দুঃখবাদ (প্রবন্ধ)—শ্রীজীবেন্দ্র সিংহ রায়	১৪
৬।	ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি (বাণিজ্য প্রসঙ্গ)—শ্রীরণজিতকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	১৬
৭।	রঙের রহস্য (বিজ্ঞান-কথা)—শ্রীসুনীল দাশগুপ্ত	১৮
৮।	মাটির মায়া (গল্প)—শ্রীকল্পনা নাগ	১৯
৯।	ছাত্র (নক্সা)—শ্রীললিত সেন	২২
১০।	শাঁখা (গল্প)—শ্রীমনোরঞ্জন জানা	২৫
১১।	আগুন (গল্প)—শ্রীসুহাসকুমার রায়	৩১
১২।	হে বরেণ্য বিদ্যাব্রতী (প্রশস্তি-কবিতা)—অধ্যাপক শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়	৩৫
১৩।	রুদ্র-বরণ (কবিতা)—শ্রীসংযুক্তা কর	৩৬
১৪।	কে বলে তুমি বাহিরে রহ (কবিতা)—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন	৩৬
১৫।	নৌকা বেয়ে চল্ (কবিতা)—শ্রীপূর্ণেন্দুকুমার মল্লিক	৩৭
১৬।	বনের দেশে (সনেট)—শ্রীনীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার	৩৭
১৭।	ফস্ত (কবিতা)—ফ. ভূ. মু.	৩৭
১৮।	আগ্নেয়গিরি ! ঘুমায়ে থেকো না আর (কবিতা)—শ্রীঅনিলবরণ চট্টোপাধ্যায়	৩৮
১৯।	জাগো জ্যোতির্ময় (দৃশ্যনাট্য)—শ্রীপীযূষকান্তি চট্টোপাধ্যায় ...	৩৮
২০।	কলেজে কয়েক ঘণ্টা (আলোচনা)—শ্রীঅমিত রায় চৌধুরী ...	৪২
২১।	আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্য (আলোচনা)—শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য	৪৩
২২।	ধর্মপ্রাণ ভারত (আলোচনা)—শ্রীশচীনন্দন সিংহ	৪৪
২৩।	অধ্যাপক সঙ্ঘ সংবাদ	৪৫
২৪।	পুস্তক-পরিচয়—অ. র. মু.	৪৭
1.	Our Union (Report)	1
2.	Students' Union—Girls' Section (Report) ...	4
3.	The Civilisation of Babylonia and Assyria—S. B.	5
4.	Nature and Art—Mani Chatterjee ...	9
5.	Kamrup Hills (Poem)—A. K. R. ...	10
6.	Indians in South Africa—Hari Ananda Barari ...	10
7.	To Immortality (Poem)—Arunkumar Datta Gupta	13
8.	The Making of a Businessman—Prof. Siva Prasad Mukherjee	13
9.	Walk Alone (Poem)—Lalit Sen ...	15
10.	Unfinished (Poem)—Sudhangshu Sekhar Mukherjee	15
11.	Asoka the Betrayer—Bhawani Prosad Chaudhuri	16
12.	Calcutta Carnage and Asutosh College—'Pikeey'	17
13.	Asutosh College Library (Report) ...	18
१।	दुर्दिन (केहानी)—बासुदेव सेनगुप्त ...	१

ASUTOSH COLLEGE LIBRARY ESTD. 1916

আশুতোষ কলেজ পত্রিকা

একবিংশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা

আগস্ট, ১৯৪৬

সম্পাদকীয়

ভূমিকা :

আশা যৌবনের ধর্ম। নবজীবনের যৌবন-যাত্রী আমরা, সামান্য ব্যাপারেও অসামান্য আশা আমরা পোষণ করি। কিন্তু কিসের আশা আমরা করবো? নূতনের? সে-নূতন কি? কী ঐ নবযুগের রূপ? কী হবে তার ব্যবস্থা?—সে-সম্পর্কে অধিকাংশ স্থলেই একটা কূট নীরবতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ঐ কূট নীরবতাই সবচেয়ে নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। অন্ধকার ঝড়ের রাতে পথহারা পথিকের কাণে কাণে কেউ হয়ত অকস্মাৎ বলে গেলো—এগিয়ে চলো, আলো দেখতে পাবে। অথচ সমস্ত দুর্যোগ অগ্রাহ্য করে' প্রাণপণে পথিক ছুটে চললো যে-আলোর পশ্চাতে, সে কি আলেয়া?—সে কি লোকালয়?—সে কি অতিথিপরায়ণ গৃহীর ধর্মালয়?—সে কথা তো জানা হলো না? নানাকর্মে প্রমত্ত এবং উত্তেজিতের পক্ষে সেকথা জিজ্ঞেস করতে ভুল করাটা অস্বাভাবিক নয়; কিন্তু যে তাকে পথের সন্ধান দিলো তার তো বলা উচিত ছিল! কারণ সে ঐ আলোর পরিচয় রাখে বলেই জগৎ বিশ্বাস করবে। তেমনি নবযুগের কথা যাঁরা বলেন, নবযুগের পরিচয় দিতে তাঁরা প্রায়শঃই ভুলে যান। আর মুষ্টিমেয় যে-কয়জন দয়া করে সে-কথা প্রকাশ করেন, তাঁদের অধিকাংশের রূপায়নই অপূর্ণ, অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য থেকে যায়। যাঁরা সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হতে সকলকে আহ্বান করেন, তাঁরা প্রায়ই বলেন না—শান্তির রূপটা কী? এমনিতরো এড়িয়ে যাওয়ার পশ্চাতে অনেক সময় স্বার্থবুদ্ধির কার্যকলাপ ইতিহাসে ধরা পড়েছে। এবং আজো কি ধরা পড়ছে না? যে-রাজনীতি লক্ষ লক্ষ বীর যুবককে বিশ্বশান্তি ও বিশ্ব-স্বাধীনতার নামে রক্তদান করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলো, সেই মৃতেরা যদি আজ সমাধি থেকে উঠে আসতো, তবে ঐ স্বার্থপর হীন রাজনীতির প্রলোভনে ঐ তথাকথিত শান্তির জন্যে বীরের মতো মৃত্যুবরণ করতেও লজ্জাবোধ করতো। অনেক সময় পুরাতনকে মেরামত করে নতুন বলে চালাবার চেষ্টাও দেখা গেছে। কিন্তু এই দুর্বলতা উদয়ের পথে বিন্ধ্যাচলের মতো অচলায়তন তুলে ধরতে পারে। আজ প্রধানতঃ সংবাদ-পত্রেই দিচ্ছে নবযুগের ইঙ্গিত। কিন্তু সেই নবযুগের বাস্তব রূপটির সঙ্গে দেশের পরিচয় করিয়ে দেওয়াও তাদের কর্তব্য বলে মনে করি। এই বৃহৎদেশের প্রতি শিক্ষাকেন্দ্রে ভাবীকালের যে বিরাট সৈন্যবাহিনী গড়ে উঠছে, তারা জানুক কোন্ নব-পৃথিবী-বিজয়ের জন্যে তাদের এই সাধনা এবং বুঝুক যে, সে-শিক্ষা ঐ সুনির্দিষ্ট ভাবীকালের কতখানি অনুগামী। নবযুগের সে-ব্যবস্থা যদি নবযুগের বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে তাদের মানুষ করে তুলতে পারে এবং মানুষের অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে

২২শে নভেম্বরের শহীদ অনিমেষ চৌধুরী

রক্তলোহিত আগুনের আভা গগনে লাগে।
পুষ্পশোভিত তনু পাশে আজ মৃত্যু জাগে।
বীর বিদ্রোহী অতিক্রমিল বিশাল পথ
—শত শহীদের শোণিতে লোহিত যে-রাজপথ।
মরণের মুখ মহনীয় যেন অরুণ-রাগে;
এখুনি নামিবে পুষ্পশোভিত সোনার রথ।

"লক্ষ আশা অন্তরে—"

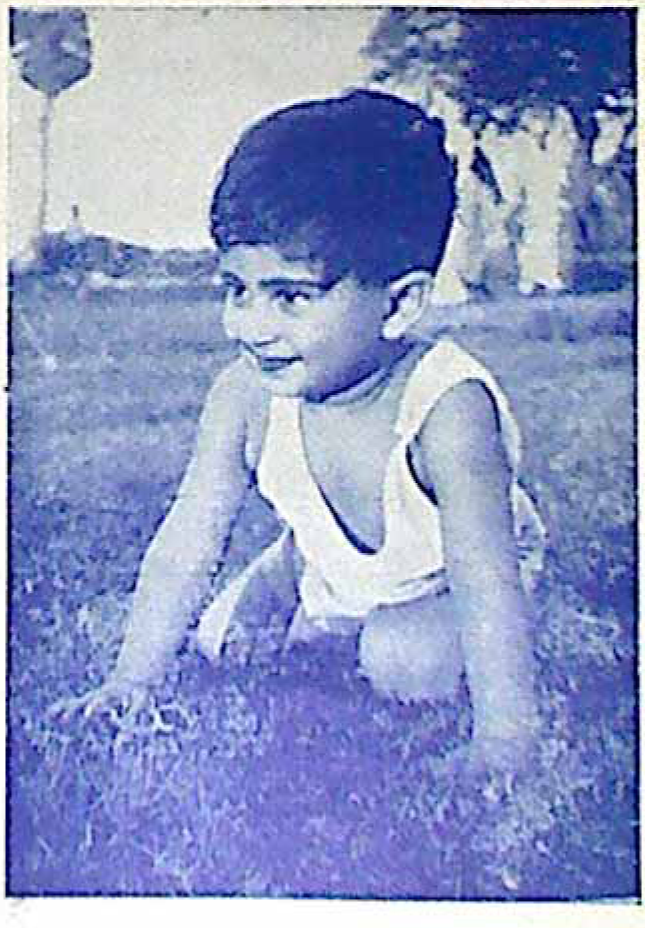

: আলোক-চিত্রশিল্পী :
রণজিত রায় চৌধুরী,
প্রাক্তন ছাত্র।

তেমনি। Dictatorship ও Tyrannyর আবির্ভাব হয় excessএর পশ্চাতে। Excess প্রতিরোধ করবার শ্রেষ্ঠ উপায় discipline. ঘরে, বাইরে, ক্লাসে, খেলার মাঠে আমরা কি disciplined হবো ?

ভাবীকালের ভারতবর্ষে

ভাবীকালের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ব্যবস্থা তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেই অনুসরণ করবে। সামাজিক ব্যবস্থাও রাজনৈতিক ব্যবস্থার মতন, যুগে যুগে যেমন করে এসেছে—তেমনি ভাবীকালেও অর্থনৈতিক আয়োজনকে সমর্থন করে তারই সঙ্গে মিল রেখে গড়ে উঠবে। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রধানতঃ দুটী উপায়ে গঠিত হতে পারে:—সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক। একদিকে চরম সমাজতান্ত্রিকতা, যার আদেশ হচ্ছে—উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন এবং স্বত্বস্বামিত্ব সবকিছু থাকবে রাষ্ট্রের হাতে, অসাম্য থাকবে না, জাতিবর্ণ ভেদ বলে কিছু থাকবে না, প্রত্যেক মানুষকে একই রকম বলে ধরা হবে, distinction of character or between groups বলে' কিছু স্বীকার করা হবে না, রাষ্ট্রের আদর্শ হবে "From each according to his capacity, to each according to his need"। অন্যদিকে রয়েছে ধনতান্ত্রিকতা বা capitalism, socialism এর শত্রু, যার ব্যবস্থায় রাষ্ট্র পুলিশ ছাড়া কিছুই নয়; উৎপাদন বণ্টন স্বত্বস্বামিত্ব সব কিছু হবে competition এর মধ্য দিয়ে, private enterprise সেখানে সব কিছুর ভার নেবে, profit motive হবে শ্রেষ্ঠ আদর্শ, land, labour capital ও organisation এর ন্যায্য দাবী নির্ণয় করবে capitalist producer, রাষ্ট্রের তাতে কোন হাত থাকবে না। এই দুই চরমের মাঝখানে আপোষ করে পাওয়া একটা Golden Mean ধরে চলবার প্রয়াস পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের মতো ভারতবর্ষেও দেখা যাচ্ছে। একদিকে বোম্বাই পরিকল্পনা মুনাফা বৃত্তিকে উৎপাদনের উৎকর্ষতা-লাভের জন্যে চরমলক্ষ্য বলে গ্রহণ করলেও একথা সহজভাবেই স্বীকার ক'রে নিয়েছে যে, Planned Economyতে সুপরিকল্পিত কৃষি-শিল্পোন্নতির পথে আমাদের মৃতপ্রায় অর্থনীতির একটা সর্বাঙ্গীন পরিপুষ্টিসাধন করতে হলে State-control রাখতেই হবে। Planning এবং State-control এ দুটি বস্তু সোশ্যালিজমেরই অবদান। অপরদিকে গান্ধীজীর সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনায় Equality এবং State-controlএর কথা অনেক বলা হলেও, Equitable distribution এবং village co-operative economy এর যে আদর্শ স্থাপন করা হয়েছে—তাতে ধনতন্ত্রের সঙ্গে একটা আপোষের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রাজনৈতিক দিক থেকে বলা চলে যে, সর্ব-ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র এখনো আমাদের অধিকাংশের কাম্য।

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে

ঐ যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের যে আকাঙ্ক্ষা তার মূলে রয়েছে এক আশা—একের মধ্যে বৈচিত্র্যকে রক্ষা করে বিরোধকে অতিক্রম করে যাওয়া। পৃথিবী রাজনৈতিক পরিস্থিতেও এমনি একটা সর্বরাষ্ট্রীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে সর্বধ্বংসী মহাযুদ্ধকে দূরে রাখবার একটা আকূতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। আজ অসীম শক্তিশালী বিজ্ঞান মানুষের হাতে অসম্ভব সম্ভব করতে সক্ষম। কিন্তু এই সক্ষমতার মধ্যে যে এক ভয়ঙ্কর ধ্বংসযজ্ঞের

সমর্থ হয়, তবে সে-ব্যবস্থার উপযোগী হবার জন্যে তারা তৈরী হবে—এরি মানে হলো নবযুগের জন্যে তৈরী হওয়া। একটা কথার জন্যে মানুষ প্রাণ দেয় না, দেয় সেই কথার পেছনে যে বিরাট বাস্তব অনুগমন করে, তারই জন্যে। আমাদের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা তাদের ঐ ভবিষ্যতের উপযুক্ত করতে পারবে কি? যদি না পারে, তবে তার অমূলক কীর্তি-সৌধ ভেঙে একাকার করে ধূলোয় মিশিয়ে দিতে দুঃখ কি?

উদয়ের পথে মহাভারত:

বহুদিনব্যাপী সংগ্রামপুঞ্জের উপর্যুপরি ঘাত-প্রতিঘাতে শুষ্ক সম্মুক্ত এক মহাভারতবর্ষ আজ এক নবযুগের গোধূলি-প্রান্তে সমুপস্থিত। দাসত্বে বহুদিন আমরা সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিলুম, ভেবেছিলুম আমাদের বুঝি উদ্ধার নেই, জীবনের ছিন্নতন্ত্রীগুলি থেকে যে ঐক্যতান হারিয়ে গেছে, নতুন-করে-বাঁধা তারে বুঝি তাকে ফিরিয়ে পাবো না। বুঝি এমনি বছরের পর বছর আমাদের জীবনের ঘানি এমনি বিদেশীর হাতের শাসনে ঘুরতে থাকবে একঘেয়ে ভাবে। কিন্তু আজ আঘাতের পর আঘাতে আমরা সচেতন হয়ে উঠেছি, "অমৃতস্য পুত্রাঃ" বলে নিজেদের অসীম শক্তিশালী আত্মার পরিচয় লাভ করেছি, অনুভব করছি একটা বিগতপ্রয়োজন জীবনের গুরুভার বেদনা, আকুল হয়ে চাইছি বন্ধনহীন নবতম এক জীবনযাত্রা। কর্মতৎপর স্বাধীন সমাজের দৃঢ় ভিত্তি গঠনে অগ্রসর কোটি কোটি নরনারী আজ জাগ্রত। একই লক্ষ্যে অগ্রসরমান জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সমগ্র দেশ—ফুরিয়ে এসেছে বর্তমান ব্যবস্থার আয়ুকাল, মুক্তির উষালোকে ঐ জীর্ণ ব্যবস্থার সমাধির উপরে দেখতে চাই নতুন জীবনের সঙ্কল্প-সৌধ। আজ আমরা জানি, আমরা সব করতে পারি, আমরাও মানুষ, তাই মানুষের মত বুক ফুলিয়ে আমরা বলতে পারি—আমাদের পথ রুখতে চেয়ো না, এই বন্যার প্রবাহে সব বাধা ভাসিয়ে নেবে, একে প্রতিরোধ করা দুরাশা মাত্র।

ছাত্রসমাজ এবং ভাবী-সংগ্রাম:

উপরে আমরা বলেছি যে, একটা common goal বা সাধারণ লক্ষ্য থেকে একটা প্রবল অনুপ্রেরণা প্রবাহিত হয়েছে সমগ্র জাতি-চিত্তে, যার ফলে দেশ হয়ে উঠেছে পরিবর্তনকামী। কিন্তু একথা ঠিক যে, ঐ পরিবর্তন আনবার জন্যে কর্মপথে এগিয়ে আসবার সৎসাহস এখনো জনতা পায়নি। এখনো তারা নিজে থেকে সংঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে পারে না। সব আন্দোলনের নেতৃত্ব করছে ছাত্রসমাজ, জনতাকে উদ্বুদ্ধ করে দেবার প্রয়াস পেয়েছে ওরাই। শিক্ষা-বঞ্চিত দেশে এই ছাত্রসমাজই নির্ভর। ভাবী বিপ্লবের vanguard হবে ওরাই। ওদের নিজেদের সংহতি ও শক্তির উপর তাই অনেক নির্ভর করবে। আজ দেশে অসংখ্য বিবদমান দলের ক্রমবর্ধমান প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি। এই সব দলাদলিতে যেন আগামী বিপ্লবের শক্তি-কেন্দ্রকে দুর্বল করে না দেয়, "আমি হিন্দু" "আমি মুসলমান" একথা বেশী ভাবতে গিয়ে ওরা যেন ভুলে না বসে এই সত্য "সকলের উপর আমি মানুষ—মানুষের অধিকার আমায় পেতেই হবে"। শক্তির অপচয় যেন না হয়, কোন কিছুতে short coming যেমন অনিষ্টকর, excessও

কিন্তু ইহাতে ভারতবাসীর বিশেষ কোন সুবিধা হইবে না। সুবিধার মধ্যে হয়ত ইঙ্গমার্কিণ প্রতিযোগিতায় পণ্যদ্রব্যের মূল্য কিছু কমিতে পারে। আমাদের সুবিধার ও ভারতের শিল্পকে বাঁচাইবার জন্য চাই শিল্প সংরক্ষণের ব্যবস্থা। যুদ্ধের সময় যখন বাহির হইতে মাল আমদানী একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল, তখন ভারত সরকার দেশীয় বণিকদিগকে নূতন নূতন শিল্প প্রচেষ্টায় উৎসাহ দিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যতে শিল্প-সংরক্ষণের আশ্বাস দিয়াছিলেন। কিন্তু এই বিষয়ে স্যার আজিজুল যে-বিল কেন্দ্রীয় পরিষদে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে মাত্র কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্যের নাম পাওয়া যায়; অবশ্য তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, শিল্প সংরক্ষণ সমিতির কলিকাতা অধিবেশনের পর আরও কয়েকটা শিল্প সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইবে। ইহার ফলে ছোট বড় অনেক শিল্প উঠিয়া যাইতে বাধ্য হইবে এবং যুদ্ধোত্তর বেকার সমস্যা আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করিবে। ভারত সরকারের অনতিবিলম্বে ছোট বড় সকল শিল্পের জন্য উচ্চহারে আমদানীকর ধার্য করিয়া সেই অর্থ জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য ব্যয় করা উচিত। ইহাতে ভারতের শিল্পোন্নতি, বেকার সমস্যার সমাধান ও যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের জন্য অর্থের সংস্থান হইবে।

* * * *

১৯২৪ সালে 'ভারতীয় কর তদন্ত সমিতি' যে উত্তরাধিকার করকে সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহা এতদিন সরকারের ক্ষমতার বহির্ভূত থাকায় চালু হয় নাই। কেন্দ্রীয় পরিষদের সংবাদে জানা যায় যে, শীঘ্রই এই কর ধার্য্যের ব্যবস্থা হইবে এবং আমাদের মনে হয় বৃহৎ সম্পত্তির অধিকারীরা ছাড়া কেহই ইহাতে আপত্তি জানাইবেন না। দরিদ্র ভারতবাসীর উপর কোনরূপ পরোক্ষ কর ধার্য্য না করিয়া অতিরিক্ত লাভ কর, আয় কর, উত্তরাধিকার কর প্রভৃতি প্রত্যক্ষ কর ধার্য্য করা উচিত। ইহাতে ধনবণ্টন-বৈষম্য কিঞ্চিৎ লাঘব করিয়া দরিদ্র ভারতবাসীর জীবন যাত্রার মান উন্নত করিতে পারিবে। কংগ্রেসী সদস্য দেওয়ান চমনলালের হিসাবে ইহা হইতে প্রায় ৩০০ কোটী টাকা আয় হইবে এবং তাহা হইলে সুপারী, দিয়াশলাই, তামাক, কেরোসিন প্রভৃতি দরিদ্রের নিত্য ব্যবহার্য্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর উপর হইতে কর উঠাইয়া লইবার সুবিধা হইবে। এই বিলে কৃষি জমিকে করের আওতা হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে হয় বড় বড় জমির মালিকদিগকেও এই আইনের কবলে না ফেলিলে ধনীরা সাধারণতঃ উচ্চহারে জমি কিনিয়া টাকা সঞ্চয় করিবে; এবং ছোট ছোট কৃষকদিগকে নিঃস্ব করিবে। যাহাই হউক, এই করের আশু প্রচলন সকলের পক্ষেই কাম্য।

* * * *

মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় চিন্তাশীল ব্যক্তিকে গোঁড়া উনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব লইয়া দশমিক মুদ্রা প্রবর্ত্তনের জন্য আনীত বিলটীর বিরোধিতা করিতে দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। তাঁহার দুইটী যুক্তির একটী হইতেছে যে, যেহেতু ব্রিটিশ তাহার নিজ গৃহে (বৃটেনে) এই প্রথা চালু করে নাই, সেইহেতু নিশ্চয় ইহার কিছু দোষ আছে। গান্ধী কোন বিষয়েই ব্রিটীশের অনুকরণ করিতে ভালবাসেন না একথা সকলেই জানেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁহার অনুকরণের ইচ্ছা আসিল কোথা হইতে? যাহা হউক, তাঁহার দ্বিতীয় যুক্তি হইতেছে যে, নূতন মুদ্রা প্রচলনের দ্বারা অজ্ঞ জনসাধারণের ক্ষতি করা হইবে।

ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে, তার প্রমাণ দিয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। তাই ঐ পরিণামকে এড়িয়ে যাবার জন্যে গড়ে উঠলো U.N.O.—সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠান—পুরানো Leagueএর ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারী। কিন্তু ঐ পরিণামকে যেন ঠেকিয়ে রাখা যাবেনা। স্বার্থান্বেষী বৃহৎ শক্তিবর্গের পরস্পর বিরোধী কার্যকলাপে অল্পায়ু শান্তির অপমৃত্যু যেন টেনে আনছে। যেখানে Four Freedomএর ধূম্রজালে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থকে লুকিয়ে রাখবার আয়োজন, যেখানে পরাধীন জাতির অপমান নির্যাতন বিজয়ীর ঘরোয়া ব্যাপাররূপে পরিগণিত, যেখানে Sphere of Influence সৃষ্টির চক্রান্তে দুর্বল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা পদে পদে বিপন্ন সেখানে নবপৃথিবী রচনার আশা কোথায়? শক্তিমদমত্ত Sovereign Nation State আজ অ্যাটম বোমার ভয় দেখিয়ে শান্তিরক্ষা করতে চায়, একমুখে সে বলে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কথা, অন্যমুখে তার লুকিয়ে থাকে Autarkyর Dogma, সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা সুপরিবেষ্টিত ব্যবস্থায় অসীম শক্তিশালী হয়ে ওঠার আশা। কিন্তু ঐ পথেই কি শান্তি? সভ্যতার বিপদ কি আজ আসন্ন নয়? যদি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সকলে এক হয়ে পরস্পরের ক্ষুদ্র ভেদাভেদ ভুলে একত্র হয়ে শান্তিরচনায় সচেষ্ট না হই, তবে লাস্কির ভাষায় "Yet the only alternative is disaster" মানুষকে দীর্ঘায়ু করবার জন্যে অভিনব 'সিরাম' আবিষ্কার করলেও [যেমন রাশিয়ায় হয়েছে] তাকে আমরা ঐ পরিণতির হাত থেকে বাঁচাতে পারবো না।

পৃথিবী হ'তে বিদায়?

বৃহৎ শক্তিত্রয়ের মতানৈক্য ও স্বার্থবুদ্ধি-সঞ্জাত দ্বন্দ্বের ফলে সম্মিলিত জাতিপ্রতিষ্ঠানের সমাধি রচনা যখন আগতপ্রায়, তৃতীয় মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা যখন বিভীষিকার মতো রণক্লান্ত পৃথিবীর ভগ্নবুকে সঞ্চারিত, ঠিক সেই সময়েই আমরা শুনতে পেলুম বৈজ্ঞানিকের উদার দৃষ্টি স্বার্থবিধ্বস্ত ধরণীর সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করে বিশ্বলোকের পথে জয়যাত্রা করেছে—তার প্রমাণ মার্কিণ যুক্তরাজ্যে রাডার রশ্মির সাহায্যে চন্দ্রালোকের চিত্রগ্রহণ এবং অষ্ট্রেলিয়ায় ঐ রশ্মিরই সহায়তায় সৌরমণ্ডলের পর্যবেক্ষণ ও পটনির্ম্মাণ। এই আবিষ্কারের নতুন সম্ভাবনা এই যে, এর ফলে ভবিষ্যতে আমাদের প্রতিবেশী গ্রহসমবায়ের নির্খুঁত পরিচয় জানবার সুবিধা হবে; হয়ত কোনোদিন অ্যাটম ও জাগতিক রশ্মি (Cosmic Ray) দানবের হাতে পড়ে মানব-গোষ্ঠিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইলে, মানব-জীবন ও মানব-সভ্যতাকে বাঁচাবার জন্যে আমরা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে যাবো অন্য কোনো গ্রহে।

আধুনিক বাণিজ্য জগৎ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে বৃটেন শুধু তৃতীয় শ্রেণীর শক্তিতেই পরিণত হয় নাই, এখন হইতে সে অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ছোট অংশীদারে পরিণত হইয়াছে। তাহার ফলে বৃটেন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধে তাহার নিজস্ব সাম্রাজ্যিক সুবিধাগুলি ছাড়িয়া দিতে রাজী হইয়াছে।

আশুতোষ কলেজ পরিচালন সমিতি (Governing Body)-এর সভাপতি, দেশবরেণ্য ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কিছুদিন পূর্বে কঠিন রোগে ভুগিতেছিলেন। শ্রীভগবানের কৃপায় তিনি আজ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার আরোগ্যলাভের সংবাদে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই পুলকিত হইবেন। তিনি একজন দেশহিতব্রতী ও প্রকৃত দেশনায়ক—স্বদেশের শিক্ষাপদ্ধতির উন্নতিকল্পে ও ছাত্রবর্গের সর্ববিধ উন্নতি কামনায় তিনি যাহা করিয়াছেন ও বর্তমানে করিতেছেন, তাহা সত্য সত্যই অতুলনীয়। তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করুন, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া এই প্রার্থনাই আমরা করিতেছি।

*　　*　　*　　*

ডাঃ রাধাবিনোদ পালের অবসর-গ্রহণের পর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ভাইস-চ্যান্সেলর'-পদে বৃত হইয়াছেন। আমাদের কলেজের পরিচালন-সমিতিরও তিনি একজন বিশিষ্ট সদস্য। তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

*　　*　　*　　*

আমাদের কলেজের ছাত্রী শ্রীমতি দুর্গা বন্দ্যোপাধ্যায় এ বৎসর বাংলা ভাষায় প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় হইয়া 'অনার্স' লাভ করিয়াছেন। স্মরণ থাকিতে পারে, গত বৎসরেও শ্রীমতি নীলিনা দত্ত আমাদের কলেজ হইতে বাংলায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। শ্রীমতি দত্ত ও শ্রীমতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অসামান্য সাফল্যে তাঁহাদের উভয়কে আমরা অভিনন্দন জানাইতেছি।

*　　*　　*　　*

আশুতোষ কলেজ ছাত্র-সমিতির (Students' Union) ১৯৪৬-৪৭ সালের জন্য নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণকে লইয়া কার্যনির্বাহক পরিষদ গঠিত হইয়াছে :—সর্বাধিনায়ক—অধ্যক্ষ শ্রীপঞ্চানন সিংহ ; সভাপতি—অধ্যাপক শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল ; সহঃ সভাপতি—শ্রীভবানী চৌধুরী ; সাধারণ সম্পাদক—শ্রীপ্রতুল রায় ; সহঃ সম্পাদক—শ্রীজ্যোতিষ গঙ্গোপাধ্যায়। ইঁহাদের সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জানাই।

*　　*　　*　　*

দেশের ধর্ম, শিক্ষা, সামাজিক বা রাজনৈতিক—যে কোনো প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব, বহুলাংশে নির্ভর করে সেই প্রতিষ্ঠানগুলির সভ্যবৃন্দের মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার উপর। বহু বৎসর ধরিয়া প্রতিষ্ঠানের কর্মপদ্ধতির যে-ধারা চলিয়া আসিতেছে তাহাকে বজায় রাখার ভার যাহাদের উপর, প্রতিষ্ঠানের কৃষ্টি ও মর্যাদাকে রক্ষা করিবার ভারও তাহাদের উপরেই বর্তাইবে। আমাদের কলেজের ছাত্রী, দিবা ও নৈশ এই তিনটি বিভাগে এই 'সেশনে' যে-সকল নূতন ছাত্রছাত্রী হৃদয়ে নব আশা ও উদ্দীপনা নিয়া যোগদান করিতেছেন, তাঁহাদের দেখিয়া উপরের কথাটি মনে পড়িয়া গেল। এই বিষয়ে 'আশুতোষ কলেজ বাঙ্‌লা সাহিত্য সমিতি'র উদ্যমের প্রশংসা করি। মাত্র কয়েকমাস হইল সমিতির নূতন কর্মপরিষদ গঠিত হইয়াছে, কিন্তু কর্মিবৃন্দের কর্মকুশলতার উপর ইতিমধ্যেই আস্থাবান হইয়া উঠিতেছি। আমরা 'বাঙ্‌লা সাহিত্য সমিতি'র শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

আমাদের দেশের জনসাধারণের অজ্ঞতা সম্বন্ধে এত হীন ধারণা করা উচিত নয়। হিন্দুরাজত্বের সময় হইতে ভারতবর্ষে অনেক মুদ্রারই প্রচলন হইয়াছে এবং জনসাধারণ তাহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। অনুন্নত তুর্কীও অল্প সময়ের মধ্যেই দশমিক প্রবর্ত্তন করিতে পারিয়াছে। অধিক দূর নয়, হায়দ্রাবাদে ব্রিটীশ ভারত ও নিজাম সরকারের দ্বিবিধ মুদ্রা প্রচলিত আছে এবং তথায় দরিদ্র অশিক্ষিত জনসাধারণ উক্ত উভয় শ্রেণীর মুদ্রার বিনিময় হার বুঝিয়া কাজ কারবার চালাইতেছে। অতীতে ভারতবর্ষে আর্য্যগণও এই প্রথা অবলম্বন করিতেন। বৃটেন অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষ ব্যতীত প্রতিটি সভ্য দেশে ইহার প্রচলন আছে। ইহার ভিত্তি বৈজ্ঞানিক মতবাদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। ইহা যখন ছাত্র, ব্যবসায়ী, কেরানী, হিসাব রক্ষক ও শিক্ষকগণের সময় ও পরিশ্রম বাঁচাইবে, তখন গ্রামবাসীদিগকেও দৈনন্দিন হিসাবের কাজে উপকার দিবে। এই বিলের আশু প্রয়োজনের উল্লেখ করিয়া পণ্ডিত জহরলাল ও ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি ডক্টর আফজল হোসেন এক যুক্ত বিবৃতি দিয়াছেন। এই বিলে শুধু মুদ্রায় দশমিক প্রথাকে সীমাবদ্ধ না করিয়া অন্যান্য মাপ ও ওজনের মধ্যেও প্রচলন করা উচিত।

আমাদের নানা প্রসঙ্গ

পূর্বে আমাদের কলেজ পত্রিকা বৎসরে তিনবার তিন সংখ্যায় বাহির হইত। কাগজ বাজারে যথেষ্ট মিলিতেছে, কলেজ কর্তৃপক্ষ-ও অর্থব্যয় করিতে অসম্মত নহেন—শুধু সরকার বাহাদুর এতটুকু এক টুক্‌রা কাগজে 'অনুমতি' প্রদান করিলেই পূর্বের সুদিনে আমরা ফিরিতে পারি। ফিরিতে পারিব কি?

কলেজ পত্রিকার 'একবিংশ খণ্ড-প্রথম সংখ্যা' এতদিনে বাহির করিতে পারিয়া নিজেদিগকে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতেছি। সংখ্যাটি গত গ্রীষ্মের ছুটীর পূর্বেই বাহির করিবার তোড়জোড় চলিতেছিল; কিন্তু বহু অনিবার্য ঝড়-ঝঞ্ঝা আসিয়া আমাদের আশায় বাদ সাধিয়াছিল; তজ্জন্য আমাদের লজ্জার অবধি নাই। পরন্তু আরেকটি অভিযোগ সম্বন্ধেও আমরা সচেতন হইয়াছি; কিন্তু হইয়াই-বা কী করিব—উপায় নাই। পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা আমাদের অত্যন্ত অল্প; বিশেষতঃ ১৯৪৫ সালের মধ্যভাগে আমাদের ছাত্রীবিভাগ ও দিবাবিভাগের সহিত নৈশবিভাগ (বাণিজ্য)-এর বন্ধুগণ আসিয়া মিলিত হইয়া আমাদের সংখ্যা-পুষ্টিসাধনে সাহায্য করিয়াছেন। কিন্তু সেই অনুপাতে পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি করিবার কোনো-প্রকারের 'দাওয়াই' আমরা এখনও আবিষ্কার করিয়া উঠিতে পারি নাই। আমাদের এত অসুবিধা ও দুর্দশা চক্ষে দেখিয়াও সরকার বাহাদুরের মন গলে না—কী করিব, ভাগ্য মন্দ!

* * * *

এবারে কিছু হিন্দী-রচনা পত্রিকায় প্রকাশ করা গেল। রচনা মনোনয়ন ব্যাপারে অধ্যাপক শ্রীযুত রামনারায়ণ সিংহ, শ্রীযুত রেবতীরঞ্জন সিংহ এবং চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীযুত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আমাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

* * * *

আশুতোষ কলেজ বাঙলা সাহিত্য সমিতি

সদস্যবৃন্দ—১৯৪৬

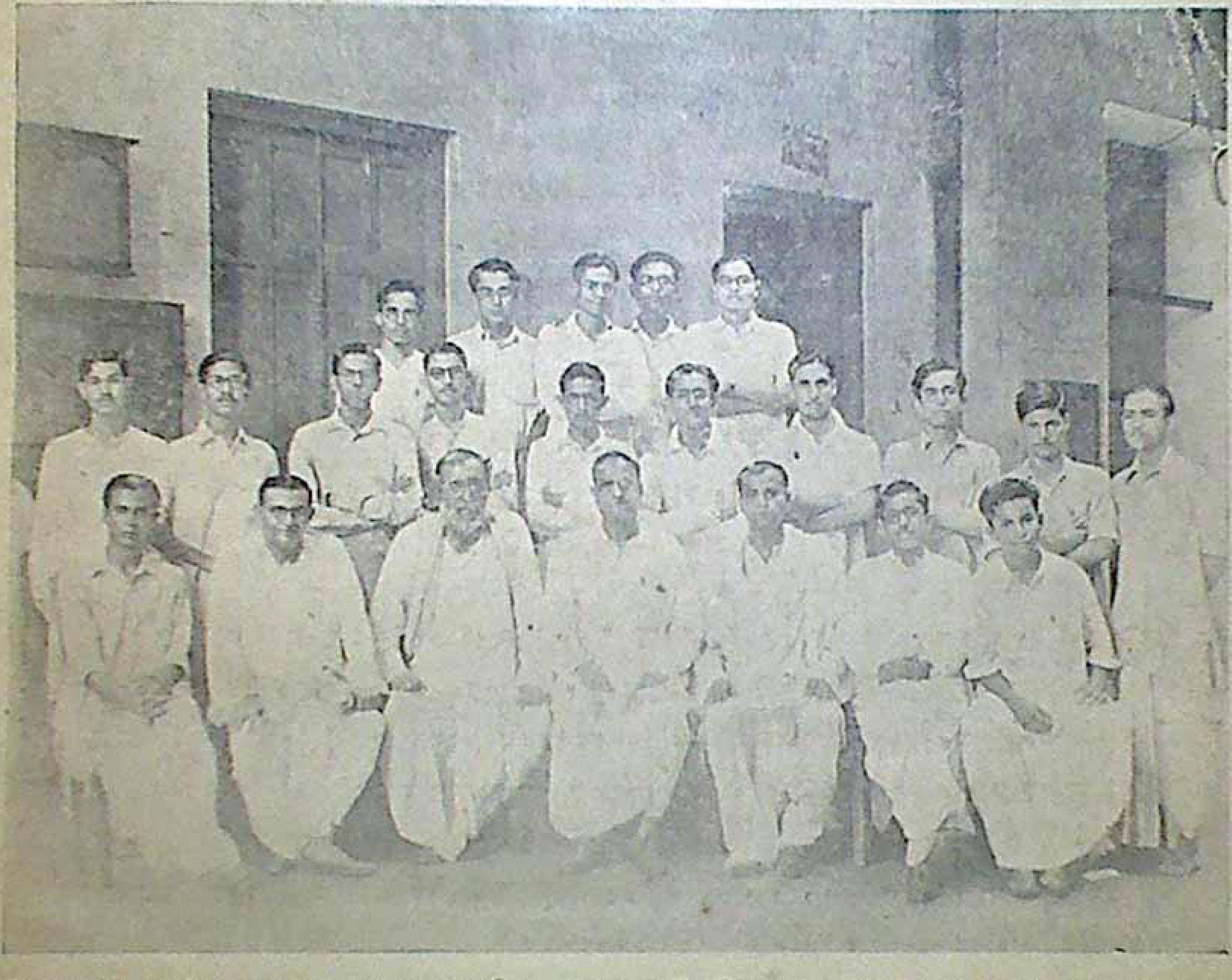

[বাঁ থেকে] বসে' :—প্রতুল রায় (সহ-সভাপতি), অধ্যাপক বিভূতি ঘোষাল, অধ্যক্ষ পঞ্চানন সিংহ (সর্বাধিনায়ক), সহাধ্যক্ষ সোমেশ্বরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক অমিয়রতন মুখোপাধ্যায় (সভাপতি), পীযূষকান্তি চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক) ও জ্যোতিষ গঙ্গোপাধ্যায়।

দাঁড়িয়ে (১ম সারি) :—শচীনন্দন সিংহ, উমানন্দ বসু, অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকৃতি বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল ভট্টাচার্য, সুজয় দত্ত, সতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ দত্তগুপ্ত, সুনীতি চক্রবর্তী (সহ-সম্পাদক) ও কল্যাণ চক্রবর্তী।

দাঁড়িয়ে (২য় সারি) :—রামেন্দু দত্ত, অমিত রায় চৌধুরী, ললিত সেন, সত্যব্রত সেনগুপ্ত ও ক্ষিতীন্দ্র রায় চৌধুরী।

"বাঙ্‌লা সাহিত্য সমিতি"

কার্য-বিবরণী—(জানুয়ারী-এপ্রিল, ১৯৪৬)

সাধারণ সম্পাদক—শ্রীপীযূষকান্তি চট্টোপাধ্যায়

নির্বাচনী সভা :

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমিয়রতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে গত ৯ই জানুয়ারী সমিতির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রারম্ভে শ্রীপীযূষকান্তি চট্টোপাধ্যায় সাহিত্য-সমিতি ও উহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে সমিতির উদ্দেশ্য, আদর্শ ও কর্মপন্থা বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন।

সমিতির বর্তমান বৎসরের (১৯৪৬) জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন :—

সর্বাধিনায়ক—অধ্যক্ষ শ্রীপঞ্চানন সিংহ ; সভাপতি—শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায় ; সহঃ সভাপতি—শ্রীপ্রতুল রায় ; সাধারণ সম্পাদক—শ্রীপীযূষকান্তি চট্টোপাধ্যায় ; সহঃ সম্পাদক—শ্রীসুনীতিকুমার চক্রবর্তী ; কার্যকরী সমিতির সদস্য—শ্রীকল্যাণকুমার চক্রবর্তী, শ্রীঅরুণকুমার দত্তগুপ্ত, শ্রীরামেন্দু দত্ত, শ্রীসতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য ও শ্রীসুকৃতি বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে আর একটি অধিবেশনে শ্রীকেশব চক্রবর্তী ও শ্রীঅমিতরঞ্জন রায় চৌধুরীকে কার্যকরী পরিষদের সদস্যপদে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়।

সমিতির নব-নির্বাচিত সদস্যগণ ঐদিন নিম্নোক্ত সঙ্কল্প-বাণী গ্রহণ করেন :—

"আমরা বাঙ্‌লা সাহিত্যের আলোচনা করবো ; সৃষ্টির ক্ষমতা যাদের আছে, তারা সকলে মিলে সাহিত্য-সৃষ্টিতেও যত্নবান হবো। গল্প, কবিতা, গান নাটক, বিভিন্ন বিষয়ের প্রবন্ধ, বিভিন্ন প্রকারের অনুবাদ এই সমিতির মধ্যে দিয়ে প্রচার করবার সুযোগ আমরা নেব। বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য করবো আলোচনা ; করবো বাঙ্‌লায়। আমাদের চিন্তা বাঙ্‌লাতেই রেখে যাবার করবো সাধনা। নেব অনেক, কিন্তু দেবার আশাও রাখবো আমরা। বাঙ্‌লাতে যা' দেব, সমগ্র বিশ্বতেই তা' কোন-না-কোন প্রকারে রাখা হলো বলে' জানবো। সাহিত্যের নতুন দিন আসছে জাতীয় জাগরণে। মূক জনসাধারণ মুক্তি পেয়ে যখন মুখ খুলবে, সাহিত্যের বহু দিক তখন উন্মুক্ত হবে। তখন নতুন সাহিত্যের ইঙ্গিত আসবে সমগ্র বিশ্বে। সেই ইঙ্গিত যারা ধরবে বাঙ্‌লা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আমরা তাদেরি অগ্রগামী হবো।"

শরৎ-স্মৃতি-বার্ষিকী :

গত ২রা মাঘ (১৬ই জানুয়ারী) বাঙ্‌লা সাহিত্য সমিতির উদ্যোগে কলেজ-প্রাঙ্গণে "শরৎ-স্মৃতি-বার্ষিকী" উদ্‌যাপিত হয়েছে। 'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। প্রারম্ভে শ্রীকল্যাণ চক্রবর্তী কর্তৃক 'হে বীর পূর্ণ কর' গানখানি গীত হয়। তৎপর শ্রীমনীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ললিত সেন ও মনোরঞ্জন জানা প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁর সংক্ষিপ্ত অথচ সরস অভিভাষণে মানুষ-শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক তথ্য পরিবেষণ করেন। অতঃপর শ্যামল চট্টোপাধ্যায়ের 'দেশ দেশ নন্দিত করি' মন্দ্রিত তব ভেরী' সঙ্গীতটি গীত হলে পর সভার কার্য শেষ হয়।

সারস্বত সম্মেলন :

সুকবি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেবের পৌরোহিত্যে গত ২৪শে মাঘ (৭ই ফেব্রুয়ারী) কলেজ-প্রাঙ্গণে "সারস্বত সম্মেলন" অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। সঙ্গীতে হিমাংশু রায়, দেবীপ্রসাদ বসু, দুর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমারী বেলা বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুমারী গীতা রায় চৌধুরী এবং সেতারে

ভবানী চট্টোপাধ্যায় সকলকে মুগ্ধ করেন। সত্যব্রত সেন, পীযূষকান্তি চট্টোপাধ্যায়, গোপাল ভট্টাচার্য ও রামেন্দু দত্ত বেশ সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। আবৃত্তিতে অমিত রায় চৌধুরী, প্রতুল রায় ও প্রাক্তন ছাত্র নীহার ঘোষ দস্তিদার শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করেন। অধ্যাপক শ্রীবিভূতি ঘোষাল রবীন্দ্রনাথ থেকে 'উর্বশী' কবিতাটি তাঁর উদাত্ত স্বরে আবৃত্তি করেন।

সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন যে, "সরস্বতী শুধু বিদ্যা ও জ্ঞানের নয়, শৌর্য বীর্য সব কিছুরই অধিষ্ঠাত্রী দেবী তিনি। তিনি 'ভদ্রকালী'। শ্বেতকমলের মধ্যে তিনি বিরাজ করছেন। কিন্তু তাঁর পূজোয় পলাশফুলের প্রয়োজন হয়। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, শ্বেতবসনার পূজোয় পলাশের কি দরকার? তার উত্তর এই যে, ঐ রক্তপুষ্পই শৌর্য-বীর্যের প্রতীক। অধুনা-প্রচলিত 'জয় হিন্দ্' ধ্বনি সেই শক্তি-সাহসেরই জয়গান করছে। আমাদের দেশে এখনও যেমন বীরাষ্টমী পূজো হয়, তেমনি ছাত্রদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহেও শৌর্যের প্রদর্শনী করা দরকার।"

এর পরে সভাপতি মহাশয় সারস্বত সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য এবং তার পূর্বতন ইতিহাস ও পটভূমিকা সুন্দর করে সভাজনদের বুঝিয়ে দেন।

পরিশেষে 'কদম্ কদম্ বঢ়ায়ে জা' সমবেত সঙ্গীতখানি সকলকে পরিতৃপ্ত করে।

প্রাক্তন সদস্যবৃন্দের সহিত মিলনোৎসব :

বাঙলা সাহিত্য সমিতির বর্তমান সদস্যগণ ২৩শে ফাল্গুন (৭ই মার্চ) প্রাক্তন সদস্যবৃন্দের সাথে এক মিলনোৎসবে সম্মিলিত হন। প্রারম্ভে বর্তমান সমিতির সম্পাদক কর্তৃক অভিনন্দন-পত্র পাঠের পর সুনীতি চক্রবর্তী একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করে' প্রাক্তন সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। এর উত্তরে সমিতির প্রাক্তন-সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারাপদ ভট্টাচার্য মহাশয় বর্তমান সমিতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীজীবেন্দ্র সিংহ রায় এবং আরও অনেকে সভায় বক্তৃতা করেন। সমিতির বর্তমান সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমিয়রতন মুখোপাধ্যায় বলেন যে, আজকের এই অনুষ্ঠান প্রাক্তন সমিতিকে বিদায় জানাচ্ছে না, নতুন করে মিলনের আগ্রহ-ই জ্ঞাপন করছে। আমরা প্রিয়জনদের যখনই আড়ম্বর করে বিদায় দিই, তখন অতীত মিলন-জীবনের মৃত্যুহীন সম্প্রীতিটাই প্রকট হয়। এই ধরণের বিদায়োৎসব অতীতের সাথে বর্তমানের ঐক্য-সূত্রকে আরও দৃঢ় করে তোলে। আমাদের সাথে তাঁদের মিলনের বন্ধন তাঁদের যাত্রাপথকে নিষ্কণ্টক নির্বিঘ্ন করে দেবে—একথা ধ্রুব সত্য। আমরা যে তাঁদের স্বীকার করেছি, তাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছি, অনেক কিছু পেয়েছি তাঁদের কাছ থেকে—এই ধরণের উৎসবে যখন তা' প্রকাশ করি, তখন বুঝতে পারি—ওঁরা যেমন আমাদের কর্মপথ উন্মুক্ত করে গেলেন—আমরা তেমনি ওঁদের যাত্রাপথ শত শুভেচ্ছায় প্রেরণা-সুন্দর করে' দিলুম। দেয়া এবং নেয়ার বাণীতে কুসুমিত এই বিদায়-সভা। শত মিলনের সৌগন্ধ্য এর মধ্যে।

সভার শেষে উপস্থিত প্রাক্তন ও বর্তমান সদস্যবৃন্দকে চা-পানে আপ্যায়িত করা হয়।

সাহিত্য-বৈঠক :

(১) সমিতির প্রথম সাহিত্য-বৈঠক ১৪ই মার্চ তারিখে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় কল্যাণকুমার চক্রবর্তীর "অন্নদামঙ্গলে সেকালের বাঙ্গালা" শীর্ষক প্রবন্ধের ও ললিত সেনের "ছাত্র" নামে একটি নক্সার আলোচনা করা হয়। সভাপতি মহাশয় অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্যের সাথে বাঙলা সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা করে' সাহিত্য-জগতে ভারতচন্দ্রের স্থান নির্দেশ করেন।

(২) সমিতির দ্বিতীয় সাহিত্য-বৈঠক আহ্বান করা হয় ৩০শে মার্চ তারিখে। উক্ত বৈঠকে 'ন্যাশনালিষ্ট'

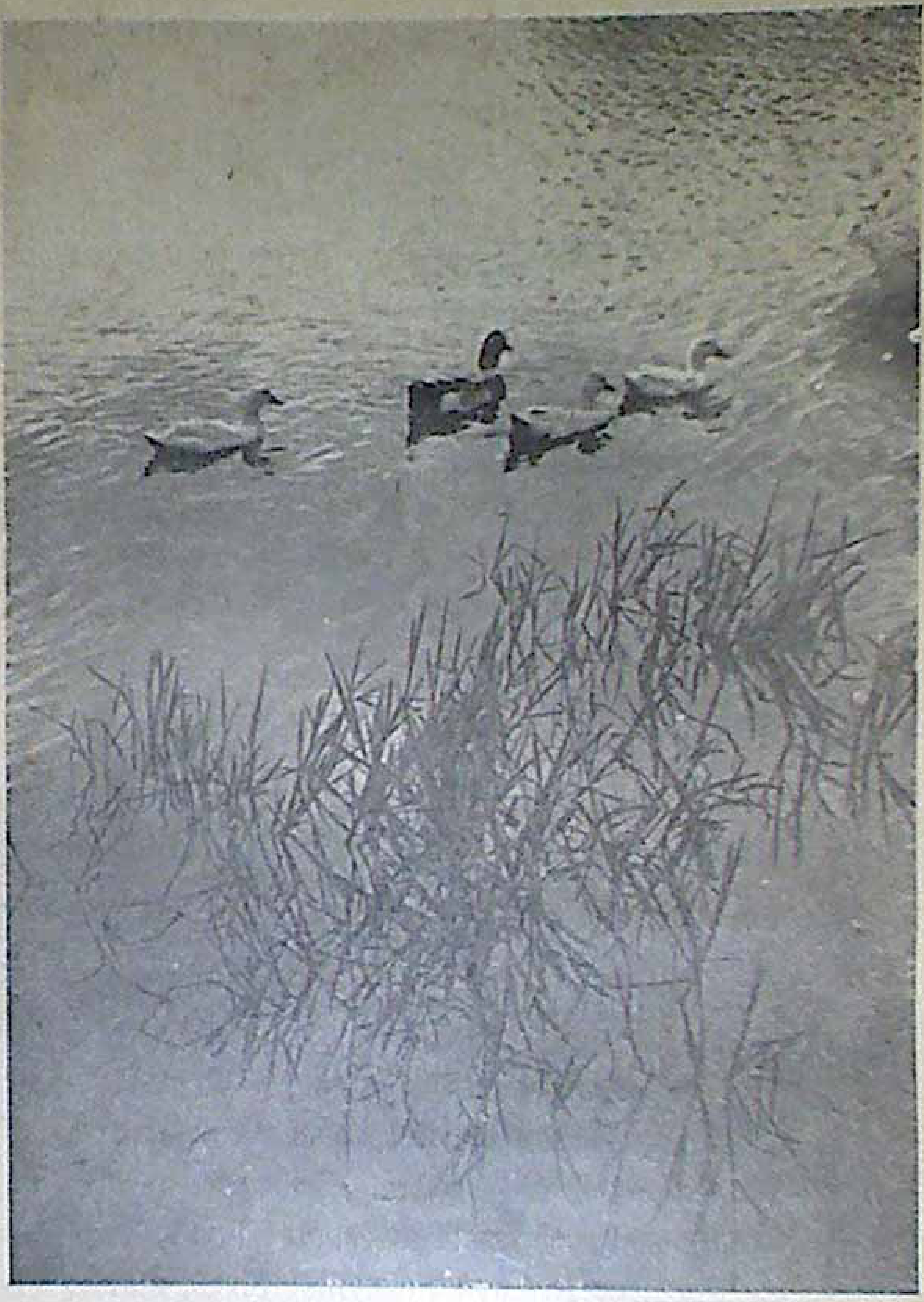

: আলোক-চিত্রশিল্পী :
শ্যামলাল বসু,
দ্বিতীয় বর্ষ, সাহিত্য

'যদি কলস ভাসায়ে জলে বসিয়া থাকিতে চাও
আপনা ভুলে।'
—রবীন্দ্রনাথ।

ফিরে পাবে, একমাত্র তখনই শাশ্বত চিরন্তন সাহিত্য উদ্ভূত হবে। আজকের নতুন বছরের দিনে জাতির স্বাধীনতা-লাভে অটুট আস্থা পোষণ করতে ছাত্রসমাজকে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি।"

অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্ত নবগোপাল দাস, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সাহিত্যিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সমিতির আদর্শ ও লক্ষ্য :

"বাঙ্‌লা যাঁর মাতৃভাষা, বাঙ্‌লা সাহিত্য তাঁর নিজের সাহিত্য, তাঁর আত্মপরিচয়। বাঙালীর পক্ষে বাঙ্‌লাকে জানা মানে নিজেকে জানা, নিজের বৃহত্তর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হওয়া। প্রত্যেক বাঙালীরই উচিত বাঙ্‌লা সাহিত্যের শিষ্য হওয়া। এই শিষ্যত্বে আছে আত্ম-জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাসা যত গভীর হয়, মনীষা ততই অতলতার অন্তর্দেশে অন্বেষণে হয় সাধনরত। 'বাঙ্‌লা সাহিত্য সমিতির' এই সাধনাই হচ্ছে লক্ষ্য। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবার যত্ন হচ্ছে সমিতির আদর্শ। এই আদর্শ প্রাদেশিকতার দোষে দুষ্ট বললে ভুল বলা হয়। নিজেকে যে মহান করে, পারিপার্শ্বিকতাকে আপনার মহত্ত্বের গৌরবে সে-ই গৌরবিত করে। আপন সাহিত্যকে যখন গভীরভাবে জানা যায়, তখন অপরাপর সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে স্বতঃই তৎপরতা জাগে। এই কারণে যথার্থভাবে যে সাহিত্যিক, সে প্রাদেশিক হতে পারে না।"

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

সমিতি যখনই যে-কোন অনুষ্ঠান করতে অগ্রসর হয়েছেন, কলেজের ছাত্রসংঘ তখনই পরিপূর্ণভাবে তাঁদের সহায়তা করেছেন। তাঁদের নিকট আমরা ঋণী। কলেজের বাঙ্‌লা বিভাগের অধ্যাপকবৃন্দ ছাড়াও অধ্যক্ষ শ্রীপঞ্চানন সিংহ, সহাধ্যক্ষ শ্রীসোমেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও শ্রীকালিদাস সেন এবং শ্রীযুক্ত বিভূতি ঘোষাল, সত্যেন্দ্রনাথ সেন, প্রমথেশ রায়, খগেন্দ্রনাথ সেন, নীরোদকুমার ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্তা অরুন্ধতী সেন প্রভৃতি অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের কাছ থেকে পেয়েছি নানা প্রকারের সাহায্য। তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। আর আমাদের সমিতির বহুবিধ অনুষ্ঠানের বিবরণ ছাপিয়ে দিয়ে অমৃতবাজার, আনন্দবাজার, ন্যাশনালিষ্ট, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, দৈনিক বসুমতী, এ্যাডভান্স প্রভৃতি সংবাদপত্র-প্রতিষ্ঠান জনসমক্ষে 'আশুতোষ কলেজ বাঙ্‌লা সাহিত্য সমিতি'কে পরিচিত করে তুলেছেন ; এই সুযোগে তাঁদেরও জানিয়ে রাখছি আমাদের কৃতজ্ঞতা।

কলেজ-পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় আমাদের আরও কিছু খবর পরিবেশন করবার বাসনা রইল।

আশুতোষ কলেজ ছাত্রাবাস

(১৬, বসন্ত বসু রোড)

সাধারণ সম্পাদক—শ্রীকল্যাণকুমার দত্ত

নেতাজী-জন্মোৎসব ও স্বাধীনতা-দিবস :

গত ২৩শে জানুয়ারী আমাদের ছাত্রাবাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্য-বিবরণী অনুযায়ী নেতাজীর জন্মোৎসব পালন করা হয়। সন্ধ্যার পর ছাত্রাবাস আলোক-মালায় সজ্জিত করা হয়।

২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা-দিবস উপলক্ষে আবাসিক-বৃন্দ এক প্রভাতফেরী বাহির করিয়া দক্ষিণ কলিকাতার কয়েকটি রাস্তা পরিভ্রমণ করে। পরে ছাত্রাবাসে জাতীয়-পতাকা উত্তোলন ও স্বাধীনতা সঙ্কল্প পাঠ করা হয়।

পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ সেন "সংবাদপত্র ও সাহিত্য" শীর্ষক একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। সাংবাদিকের কর্তব্য নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি বলেন,—"চলমান জগতের ছোট্ট ছোট্ট ছবি সাংবাদিক পাঠক-সমাজের সামনে তুলে ধরেন। কিন্তু সাংবাদিক এমন সংবাদও প্রকাশ করেন, যাহা নিঃসন্দেহে সাহিত্য-পদবাচ্য হতে পারে। সংবাদের বিশ্লেষণই সাংবাদিকের কাজ—তবুও মূল কাঠামোটি বজায় রেখে মাটি, রঙ্ প্রভৃতি দিয়ে তিনি সুন্দর প্রতিমূর্তি গড়তে পারেন।

"মানুষের দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতা নিয়েও সাহিত্য রচিত হতে পারে; কিন্তু কল্পনার যাদুস্পর্শে ঐ তুচ্ছ জীবনও মহান হয়ে ওঠে। সাহিত্যিকের মত সাংবাদিকও স্রষ্টা; তিনি সংবাদ সৃষ্টি করে চলেন।

"পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকগণ কর্তব্য-পালনে নির্ভীক ও আদর্শের প্রতি অসীম আস্থাবান ছিলেন বলেই বিখ্যাত হতে পেরেছেন। আজকের সংবাদপত্র প্রতিযোগিতার চাপে পুঁজিপতির কারবারে পরিণত হয়েছে। কোম্পানীর লাভ-লোকসান দ্বারা আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা নির্ধারিত হয়। জগতের বিশিষ্ট চিন্তানায়কদিগকে সাংবাদিকের এই দুর্দশাজনক অবস্থা অত্যন্ত চিন্তাকুল করে তুলেছে।"

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

গল্প ও কবিতা প্রতিযোগিতা :

সমিতির পক্ষ থেকে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটি গল্প ও কবিতা প্রতিযোগিতার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। গল্প ও কবিতার বিচার করেছিলেন যথাক্রমে সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ময় রায় ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিভূতি ঘোষাল। নিচে প্রতিযোগিতার ফলাফল দেওয়া হলো :—

গল্পে ঃ—প্রথম—মনোরঞ্জন জানা (৩য় বর্ষ কলা);
দ্বিতীয়—নমিতা সেন (১ম বর্ষ কলা);
বিশেষ পুরস্কার—সুনীতিকুমার চক্রবর্তী (১ম বর্ষ বিজ্ঞান)।

কবিতায় ঃ—প্রথম—পরেশচন্দ্র সাহা (৩য় বর্ষ কলা);
দ্বিতীয়—পূর্ণেন্দুকুমার মল্লিক (১ম বর্ষ বাণিজ্য);
বিশেষ পুরস্কার—সংযুক্তা কর (৩য় বর্ষ কলা)।

নববর্ষ উৎসব :

গত ১লা বৈশাখ প্রাতে সমিতির উদ্যোগে কলেজ-প্রাঙ্গণে শুভ নববর্ষ তিথি উদ্‌যাপিত হয়েছে। কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত মনোজ বসু অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। প্রারম্ভে কলেজের ছাত্রগণ নববর্ষের আবাহন-গান করেন। শ্রীযুক্ত ভক্তিময় দাশগুপ্ত, বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, কুমার প্রদ্যোৎনারায়ণ প্রভৃতি রেডিয়ো-শিল্পীগণ সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন।

অতঃপর গল্প ও কবিতা প্রতিযোগিতার বিজয়ী ছাত্রছাত্রীদিগকে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সাধারণ সম্পাদক তাঁর ভাষণের উপসংহারে গল্প ও কবিতা সংগ্রহের ব্যাপারে সহায়তা করবার জন্যে শ্রীযুক্ত কেশব চক্রবর্তী ও শ্রীযুক্ত অমিত রায় চৌধুরী (ছাত্রবিভাগ), শ্রীযুক্ত অনিল বসু (বাণিজ্যবিভাগ), কুমারী সীমন্তি চক্রবর্তী (ছাত্রীবিভাগ) এবং ছাত্রীসংঘের সভানেত্রী অধ্যাপিকা শ্রীযুক্তা অরুন্ধতী সেন মহাশয়াকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সভাপতি মহাশয় তাঁর অভিভাষণে নববর্ষের জয়গান করে বলেন,—"জাতির চিন্তায় কর্মে শিক্ষা-দীক্ষায় আজ এক নূতন প্রভাতের অভ্যুদয় হচ্ছে। ভারতবাসী আজ যে সঙ্কটময় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করছে, এতে কী করে শাশ্বত সাহিত্য গড়ে উঠবে? এ-কারণেই সাহিত্য আজকাল এত সাম্প্রতিক ও সাময়িক হয়ে পড়েছে। আজ আমাদের কণ্ঠে পরাধীনতার এক জগদ্দল পাথর চেপে বসে আছে। এর নিষ্পেষণে আমাদের অসহায় কণ্ঠ নীরব হয়ে যেতে চাইছে। স্বাধীন মন ও উন্মুক্ত চিন্তাশক্তি না থাকলে চিরন্তন সাহিত্য রচিত হতে পারে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভারতবাসী শীঘ্রই স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হবে। যখন সে স্বাধীনতা

ব্যবহারজীবি মাত্রই জানেন ও সে সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবেন। কিন্তু সেই ক্ষেত্রেই তাঁর প্রতিভা ক্ষয় হয়ে যায়নি। তাঁর সবচেয়ে বড় কাজ ছিল ছাত্রদের নিয়ে। তিনি নিজে কৃতী ছাত্র ছিলেন—এবং বড় হয়ে তিনি ছাত্রদের কল্যাণ কামনায় নিয়ত নিযুক্ত ছিলেন।

ছেলেদের তিনি কত ভালবাসতেন এবং তাঁর কতদিকে চোখ ছিল একটি ছোট উদাহরণ থেকেই বোঝা যাবে।

সে আজ পঁচিশ বছর আগের কথা। আমি তখন ল'কলেজের একজন মাষ্টার। সে সময়ে আমাদের tutorial class হোতো। ছেলেরা প্রশ্নের জবাব লিখে খাতা দিয়ে যেতো। মাষ্টারকে সেই খাতা দেখতে হোতো। খাতা দেখা হলে সেইসব খাতা আশুতোষের কাছে পাঠাতে হোতো। খাতা ফিরে আসত যখন, দেখতাম প্রত্যেক খাতার নীচে পেন্সিলে এ, এম, সই। মনে হোতো এটা একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে। সারাটা দিন আদালতে কাজ করে বিকেলে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচশ রকম কাজ সেরে—কোথায় তিব্বতের পুঁথির সন্ধান পাওয়া গেছে—Science Collegeএর laboratoryর কোন্ apparatus ভেঙ্গে গেছে—Ballygungeএর Botany Departmentএর কি ব্যবস্থা হবে—সেনেট সিণ্ডিকেটের মিটিং সেরে—ল' কলেজের এতগুলি শ্রেণীর ছেলেদের tutorial খাতা দেখা—এ সম্ভব হতে পারে না। আমাদের ধারনা ছিল যে মাষ্টাররা যাতে সজাগ থাকেন সেইজন্যেই কেবল এই খাতায় নাম সই করার ব্যবস্থা। একবার আমার ক্লাশের একটি ছেলে—নাম ছিল তার চণ্ডীপ্রসাদ খৈতান—খুব ভাল লিখেছিল। আমি তার লেখার নীচে লিখে দিলাম—"Very good. You may read"—দু'একটা বইয়ের নাম। সব খাতা রেগুলার মত গেল আশুবাবুর কাছে। ফিরে এলে দেখলাম এ, এম, সইয়ের উপর লেখা "I also recommened"—আরো কয়েকটা বই। অবাক হয়ে গেলাম। দিন তিনেক পরে ডাক এলো। তখনো বুঝিনি কেন। ভাবলাম কি আবার হোলো। গেলাম তাঁর ঘরে। প্রসন্ন মুখে বল্লেন "ওহে দাস—তোমার ক্লাশে চণ্ডী বলে যে ছেলেটি আছে সে খুব Brilliant ছেলে—খুব উৎসাহ তাকে দিয়ো। Keep an eye on him". তারপর নানা গল্প করলেন। এত ছিল তাঁর ছেলেদের প্রতি মমতা। চণ্ডী ছেলেটি আজ নেই—কিন্তু আশুবাবুর ছেলেদের জন্যে কল্যাণ কামনা রয়ে গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক বিভাগে।

তরুণ ছাত্রদের মধ্যে অনেকে তোমরা তাঁকে চক্ষে দেখ নি—কিন্তু তোমাদের জন্যে বিদ্বজ্জন সভায় তিনি আসনের ব্যবস্থা করে গেছেন। বাংলা দেশের বিদ্যামন্দিরে তিনি যে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখে গেছেন তার আলোকদীপ্তি তোমাদের কাছে আজো পৌঁছচ্ছে—তোমাদের টেনে এনেছে আজকের এই সভায়। সেই নিষ্কম্প দীপশিখা থেকে তোমরা তোমাদের অন্তরের প্রদীপটি যদি জ্বালিয়ে নিয়ে যেতে পার—আজকের জন্মতিথির সেইটেই হবে বড় সার্থকতা।

আরো অনেকে এসেছেন আজকের এই সভায় যাঁরা আমারই মত আশুবাবুর স্নেহানুগ্রহ পেয়েছেন। আজকের এই দিন আমাদের সেই কয়জনের ঋণ স্বীকারের দিন। এরও প্রয়োজন আছে মানুষের জীবনে।

আমার আর কিছু বলবার নেই। আজকের এই জন্মতিথি পালন আমাদের সকলেরই সার্থক হোক। আশুতোষের জন্মদিনে বিশেষ করে বাংলা দেশের ছাত্র-সমাজ লাভ করুক সেই নবজন্ম—যা কবি এই বলে প্রার্থনা করেছেন—

"ভয় হতে তব অভয় মাঝে নূতন জনম দাও হে।
দীনতা হ'তে অক্ষয় ধনে, সংশয় হতে সত্যসদনে,
জড়তা হ'তে নবীন জীবনে নূতন জনম দাও হে।"

আমাদের পত্রিকা :

ছাত্রাবাসের আবাসিকবৃন্দের উদ্যোগে "আমাদের কথা" নামক এক হস্তলিখিত পত্রিকা বাহির করা হইতেছে। এই পত্রিকায় আমাদের খুঁটিনাটি ঘটনা ছাড়াও প্রবন্ধ, ছোট গল্প, কবিতা প্রভৃতি নিয়মিত স্থান পায়। এই পত্রিকা ছাত্রাবাসে সাহিত্য-চর্চার বেশ একটি প্রেরণা জাগাইয়াছে। কলেজের অধ্যাপকমহলে "আমাদের কথা" খুবই সমাদর লাভ করিয়াছে।

সরস্বতী পূজা :

অন্যান্য বারের ন্যায় এইবারেও ছাত্রাবাসে বিশেষ সমারোহে বীণাপাণির অর্চনা করা হইয়াছিল। ছাত্রাবাসের পার্শ্ববর্তী ময়দানে এক সুদৃশ্য মণ্ডপে পূজা-অর্চনার ব্যবস্থা করা হয়। পূজাদিবস সন্ধ্যায় একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সহরের ও বাহিরের অনেক বিশিষ্ট শিল্পী ইহাতে যোগ দেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও তাঁহার পত্নী, কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলী ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া আমাদের অনুষ্ঠানের সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করেন। আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করা হয়। শ্রদ্ধেয় সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় বিশেষ যত্নসহকারে অনুষ্ঠানটির তত্ত্বাবধান করেন।

ছাত্রবন্ধু স্যার আশুতোষ*

মাননীয় বিচারপতি—শ্রীসুধীররঞ্জন দাস

স্যার আশুতোষের বিচিত্র কর্ম্মজীবন সম্বন্ধে বিদ্বজ্জন সমাজে দাঁড়িয়ে আলোচনা করতে পারি—এমন যোগ্যতা ও ক্ষমতা আমি দাবী করিনে। যোগ্যতর ব্যক্তিরা সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। আমার সে সম্বন্ধে বলবার কিছু নেই।

আজকে আমরা এখানে মিলিত হয়েছি আশুতোষের জন্মতিথি পালন করবার মানসে। এই অনুষ্ঠানে নানা লোক নানা ভাব নিয়ে এসেছেন—সকলের কাছেই আজকের এই দিনটির একটি নিগূঢ় অর্থ আছে।

অনেকে এসেছেন যাঁরা তাঁরা সহকর্ম্মী ছিলেন—যাঁরা তাঁর সারা জীবনের কাজকে এখনো বহন করে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের কাছে এই জন্মতিথির একটি বিশেষ মূল্য আছে। সুদূর পথের যাত্রীদের অনেক সময় পথ চলাটাই বড় জিনিষ হয়ে ওঠে। কিন্তু পথ চলার আনন্দ ক্রমে ক্ষীণ হয়ে পড়ে—ক্লান্তি ও অবসাদ এসে যায়। সেই ক্লান্ত পথিক দিনান্তে যখন একটি চটি কি সরাইখানায় উপনীত হয় তখন সে বিশ্রাম নেয়। সে তখন একবার ফিরে দেখে কতটা পথ আসা হোলো—তারপর সামনে তাকায় কতটা পথ আরো যেতে হবে। এই রাত্রির বিশ্রামের যেমন প্রয়োজন পথযাত্রীর কাছে, তেমনি প্রয়োজন এই জন্মতিথি পালন আশুতোষের সহকর্ম্মীদের জন্যে। সারা বছরের কর্ম্মক্লান্তি বয়ে তাঁরা আজকের দিনটিতে পৌঁছিয়েছেন। আজকে তাঁদের পিছন ফিরে তাকাবার দিন—তারপর সামনে তাকিয়ে এগোবার দিন সুরু হবে। আজকে তাঁদের অন্তরে বললাভ করবার দিন সেই বৃহৎ কর্ম্মজীবনের আদর্শ স্মরণ করে। তাঁদের কাছে আজকের এই অনুষ্ঠানটির সেইটেই হচ্ছে মর্ম্মকথা।

বাংলাদেশের ছাত্রমণ্ডলীর কাছে আজকের এই দিনটির একটি বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করি। তিনি বিচারপতি হিসেবে যে কত বড় ছিলেন সে কথা

*মনীষী আশুতোষের আবির্ভাবোৎসব সভায় সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ।

অর্থাৎ 'Pleasure never is at home'। সুখ যখন চিরদিন ধরে রাখা যায় না, দুঃখই যখন সত্য—তখন তার জন্যে শোক করে লাভ নেই। দুঃখ আসে আসুক, সুখ যতদিন থাকে ভোগ করে নাও—এই শেষ সিদ্ধান্ত করলেন কীটস্। তিনি মানুষকে ডেকে বললেন—'Let the fancy roam'। এ যেন আমাদের দেশের চার্বাকী দর্শন 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ'এর দ্বিতীয় সংস্করণ! পাশ্চাত্য ভোগবাদের পূজারী হয়ে কীটস্ এখানে দুঃখকে এড়িয়ে যেতে যান। দুঃখ সম্বন্ধে তাঁর উপলব্ধি নিতান্তই অগভীর।

শেলীর দুঃখবাদ কীট্‌সের চেয়ে গভীর। তাঁর মনোবিকাশ ছিল অনেকটা ভারতীয় ধরণের। এ দেশের শাস্ত্রের বাণী 'ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখম্ অস্তি'—এর প্রতিধ্বনি যেন শেলীর 'Devotion to something afar from the sphere of our sorrow'। তাই তিনি দুঃখকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন নি। একথা সত্যি তিনি দুঃখকে একটা মহান্ বস্তু বলে গ্রহণ করতে পারেন নি। শুধু তাই নয়, দুঃখের কণ্টক শয্যায় রক্তাক্ত কলেবর কবি চীৎকার করে বলেছেন—

I fall upon the thorns of life! I bleed!

তবু সাধারণের মধ্যে অসাধারণকে উপলব্ধি করবার মন ছিল বলেই মাটির পৃথিবী থেকে একটা বৃহত্তর পৃথিবীকে পাবার সাধনা ছিল বলেই তিনি দুঃখের অমা-রজনীর মধ্যেও সুখের প্রদীপ্ত রশ্মি দেখতে পেয়েছেন—

If winter comes, can spring be far
behind?

রবীন্দ্রনাথের দুঃখের উপলব্ধি এর চেয়েও অনেক গভীর। কীট্‌সের দুঃখানুভূতির মধ্যে pessimism-এরই অভিব্যক্তি, কিন্তু শেলীর মধ্যে optimismও আছে। রবীন্দ্রনাথ দুঃখ সম্বন্ধে শুধু আশাবাদীই নন, তাকে জয় করে তিনি সর্বজয়ী হতে চান। তাই তিনি বলেন—

কিসের তরে অশ্রু ঝরে, কিসের লাগি দীর্ঘশ্বাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।
রিক্ত যারা সর্বহারা সর্বজয়ী বিশ্বে তারা,
গর্বময়ী ভাগ্যদেবীর নয়কো তারা ক্রীতদাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।

শুধু তাই নয়, দুঃখের একটা মহান্ রূপ তিনি লক্ষ্য করেছেন। জীবনের অন্ধকার অধ্যায়গুলো তাঁর কাছে আত্মবিকাশের একটা প্রধান অবলম্বন। মহত্তর সুখ পেতে গেলে জীবনকে দুঃখের কষ্টি-পাথরে যাচাই করে নিতে হয়। যার বাস্তবের সংগে পরিচয় হয়নি, যে দুঃখের দাবদাহ দ্বারা অন্তরকে পুড়িয়ে নিখাদ করতে পারে নি—সে কখনও নিখুঁত জীবনের মঙ্গলশ্রী লাভ করতে পারে না। মহৎ সুখ মহৎ দুঃখের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনা—

এই করেছো ভালো, নিঠুর, এই করেছো ভালো
এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দাহন জ্বালো।
আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছু নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে দেয়না কিছুই আলো।

অন্তিম বয়সেও 'শেষ লেখায়' তিনি সেই একই কথা বলে গেছেন। তাঁর কাছে দুঃখের সাধনা শুধু পরিপূর্ণ সত্য লাভ করবার উপায়—

কঠিনেরে ভালবাসিলাম—
সে কখনো করে না বঞ্চনা।
আমৃত্যু দুঃখের তপস্যা এ জীবন—
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে····

দুঃখ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এ উপলব্ধি বেদ উপনিষদের শিক্ষা ছাড়া আর কিছু নয়। এতে ভারতের অধ্যাত্মবাদের চিরন্তন জিজ্ঞাসা সুপরিস্ফুট। ভোগবাদী কীটস্ কিংবা কল্পনাবিলাসী শেলীর দুঃখবাদের চেয়ে রবীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ অনেক গভীর, অনেক সুদূরপ্রসারী।

রবীন্দ্রসাহিত্যে দুঃখবাদ

জীবেন্দ্র সিংহ রায়—প্রাক্তন ছাত্র

বৈজ্ঞানিকরা বলেন, সূর্যের সাদা রশ্মিতেও সাত রঙ আছে। একথা সাধারণ মানুষের কাছে এক প্রকার অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের সন্ধানী দৃষ্টিতে এ তথ্যটা একটা প্রামাণ্য সত্য। রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌম প্রতিভাও অনেকটা ঐ সূর্যের রশ্মির মতই। তাকে বিশ্লেষণ করলে হাজার রঙ ধরা না পড়ে পারে না। বাঙ্‌লা সাহিত্যের এমন কোন দিক নেই যেখানে কবিগুরুর আশীর্বাদ ঝরে পড়েনি। তাঁর মনোবিকাশের ধারাগুলো নানামুখী। এজন্যে আশ্চর্য হয়ে এদেশের কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথকে তুলনা করেছেন ভারতবর্ষের সংগে—যেখানে হাজার নদী বয়ে গিয়ে অফুরন্ত ফসল ফলায়। আবার বিদেশের কেউ কেউ বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ মূর্তিমান রূপকথা। বলবার ভঙি যা'-ই হোক্—কবি-প্রশস্তির অন্তর্নিহিত কথাটুকু যে সত্যি, তা'তে সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙিতে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর সাহিত্যিক জিজ্ঞাসায় রাবীন্দ্রিকত্ব ফুটে উঠেছে সর্বত্র। পৃথিবীকে এবং মানুষকে নোতুনভাবে পেয়েছেন তিনি। কি দেশী, কি বিদেশী খুব অল্প সাহিত্যিকই তাঁর মনোরাজ্যে প্রবেশ করবার অধিকার পেয়েছেন। এজন্যই রবীন্দ্রনাথের ধ্যান-ধারণা অনেকটা সেই ছোট্ট দ্বীপের মত—যার চারদিক অগম্য লবণাক্ত সমুদ্র। সাধারণ প্রতিভাবানদের ভাবনার তরংগ সেখানে ঠিক পৌঁছে না। তাই গাঁয়ের মেয়ে যতই কালো হোক্, কবি দেখ্‌তে পান তার কালো হরিণ চোখ। উর্বশীকে দেখে রবীন্দ্রনাথের মন বাসনায় কালো হয়ে যায় না, তাঁর মনে পড়ে চিরসুন্দর পরম সত্তাকে। মদনভস্মের ভোগবাদী কবির মত তিনি দুঃখ করেন না, অতনুকে ছড়িয়ে দেন বিশ্বময়। সাধারণের মধ্যে অসাধারণকে উপলব্ধি করবার এই মনন রবীন্দ্রনাথের একান্ত নিজস্ব। এই নিজস্ব দৃষ্টিভঙির মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছে কবির আদর্শবাদ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সব কবিরই এক একটা কাব্যিক আদর্শ আছে, কিন্তু তাঁদের আদর্শবাদ ঠিক রবীন্দ্রনাথের পর্যায়ে পড়ে না। কবিগুরুর বিশেষত্ব এইখানেই।

বেদ আর উপনিষদ যে দেশে সৃষ্টি হয়েছে, সেই দেশেরই কবি রবীন্দ্রনাথ। তাই তাঁর আদর্শবাদ ভারতবর্ষকে অস্বীকার করে নয়। বৈদিক ভারত যেভাবে চিন্তা করতো, ঔপনিষদিক ভারত যে অনুজ্ঞা প্রচার করতো—ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথ তারই ধারক ও বাহক। মাতৃভূমির চিরন্তন হৃদপিণ্ডকে তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে নোতুন করে স্পন্দিত করে তুলেছেন তিনি—যা' অন্য কেউ পারেনি। 'ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি'—পার্থিব সমস্ত জিজ্ঞাসা সম্বন্ধেই শাস্ত্রের এই বাণী রবীন্দ্রসাহিত্যেরও মূল কথা। বিদেশীরা এভাবে চিন্তাই করতে পারে না। তাঁদের কল্পনার দৌড় intuition পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ আলোচনা করলে কথাটা পরিষ্কার হবে।

ইংরেজ কবি কীটস্ জান্‌তেন, সুখ চিরস্থায়ী নয়। মাটির পৃথিবীতে চল্‌তে গেলে দুঃখের কশাঘাত আসবেই। শুধু তাই নয়, তিনি আরও জানতেন—সকল সুখেরই শেষ পরিণতি দুঃখে। তাঁর এই উপলব্ধির সমর্থন পাওয়া গেল সমস্ত প্রকৃতিতে। তিনি চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন, শরতের পর শীত আসে; যৌবন শেষে বার্ধক্য আসে; নোতুনও একদিন পুরণো হয়ে যায়। তাই কীটস্ লিখলেন—

Summer's joys are spoilt by use,
And the enjoying of the spring
Fades as does its blossoming—
Autumn's red-lipp'd fruitage too
Blushing through the mists and dew
Cloys with tasting.

উচিত কিনা সেই আলোচনাই এখন সর্বত্র স্থান পাইতেছে। বৃটন উডস্ সম্মেলনে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে যে পরিকল্পনা স্থির হইয়াছিল ভারতের মুদ্রা নীতি, বহির্বাণিজ্য ও দেনাপাওনা সম্বন্ধে তাহা বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু বৃটন উডস্ সম্মেলনে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের যে পরিকল্পনা স্থির হইয়াছে, তাহা ভারতের বিরুদ্ধে একটা বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার সামিল হইয়াছে। কারণ তহবিল পরিচালনার জন্য ১২ জন প্রতিনিধি লইয়া যে কার্যনির্বাহক সমিতি গঠনের প্রস্তাব হইয়াছে তাহাতে ভারতের জন্য কোন স্থায়ী আসন সংরক্ষিত হয় নাই। উপরিউক্ত মুদ্রা তহবিলটি ৮৮০ কোটি ডলার মূলধন লইয়া গঠিত হইবে এবং তাহাতে ভারত চাঁদা দিবে ৪০ কোটি ডলার। এইখানে দেয় টাকার অল্প-কম করিয়া ধরিয়া ভারতের ভোটাধিকারও খর্ব করা হইয়াছে।

ভারতের পক্ষে আন্তর্জাতিক মুদ্রাতহবিলের এবং আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের সদস্য হওয়ার যেমন অসুবিধা আছে তেমন কতকগুলি বিশেষ সুবিধাও আছে। মার্কিণ, যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের প্রাথমিক সদস্য হইয়াছে। বাণিজ্যাদি ব্যাপারে এই সকল দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্বন্ধ খুব বেশী। সুতরাং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলে যোগদান না করিলে বাণিজ্যগত আদান-প্রদানে ভারতের বিশেষ অসুবিধা হইতে পারে দ্বিতীয়তঃ, ভারতের শিল্প ও আর্থিক উন্নতির জন্য বিশেষ ঋণের যে আসন্ন প্রয়োজনীয়তা দেখা যাইতেছে তাহাতে সংগ্রাম করিতে হইলে অচিরেই ভারতের আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের সদস্য হওয়া দরকার। বৃটন উডস্ সম্মেলনে এই ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে যে পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে বিভিন্ন দেশের প্রয়োজন অনুসারে শিল্পোন্নতির জন্য সময়োচিত ঋণ প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই ব্যাঙ্ক জামিন থাকিয়া এক দেশ হইতে অন্য দেশের জন্য ঋণ সংগ্রহ করিতে এবং মাল সরবরাহের জন্য বিদেশী মুদ্রা ও সিকিউরিটি দিয়া সাহায্য করিতে পারিবে। কাজেই সুবিধা এবং অসুবিধার কথা চিন্তা করিলে সুবিধাটাই বেশী বলিয়া মনে হয়; এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ও আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের সদস্য-পদ গ্রহণে ভারতের কোন আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না।

বর্তমান সময়ে প্রকৃতপক্ষে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে শিল্পোন্নতির প্রয়োজনীয়তাও যথেষ্ট আছে। কিন্তু বর্তমান শাসন-পদ্ধতি ভারতের শিল্পোন্নতির পক্ষে যথেষ্ট অন্তরায়। জাতীয় গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে কোন পরিকল্পনাই কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করা চলিবে না। কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে কৃষিকার্যকে গৌণ করিয়া যে শিল্পোন্নতি সম্ভব নয়, একথা অতি সত্য। কাজেই যে কোন পরিকল্পনাই গ্রহণ করি না কেন, কৃষি ও শিল্পকে পাশাপাশি রাখিতে হইবে এবং সমস্ত পরিকল্পনাটি সর্বভারতীয় হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের ভিতর দিয়া ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে একমাত্র জাতীয় শাসন পরিষদ—যাঁহারা শুধু ভাবিবেন ভারতের উন্নতির কথা, সেখানে থাকিবে না বিদেশী স্বার্থান্বেষীর গন্ধ অথবা দেশীয় ধনী সম্প্রদায়ের একমাত্র ধনস্পৃহা। তবে বর্তমান পরিস্থিতি গভীর ভাবে চিন্তা করিলে মনে একটা আশার সঞ্চার হয় যে, শীঘ্রই ভারতের প্রকৃত উন্নতি যাঁহারা চান অদূর ভবিষ্যতে তাঁহারাই অগ্রগর হইবেন দেশের মুখোজ্জ্বল করিতে।

ভারতের অর্থ নৈতিক পরিস্থিতি

রণজিতকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—চতুর্থ বর্ষ, বাণিজ্য

বিংশ শতাব্দীর যুগে অর্থ নৈতিক অবস্থার উন্নতি ব্যতিরেকে কোন জাতির নিজ প্রতিভা বিকাশ সম্ভবপর হয় না। আজকাল তাই দেখা যায় যে, অর্থ নৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে প্রায় সকলের মধ্যেই একটা জাগরণের ভাব আসিয়াছে। অর্থনীতি যে সামাজিক এবং রাজনৈতিক উন্নতিরও একটা প্রধান কারণ সেটা অনেকেই এখন উপলব্ধি করিতে চায়। অনেকেই এখন বুঝিতে সক্ষম যে—এই ধনতান্ত্রিক যুগে যে ধনীকে আমরা ভয় করি সেই ধনের সৃষ্টি করিয়াছি আমরাই—শ্রমিক সমাজ, যাহাদের অজ্ঞতা ও অপরিণামদর্শিতার সুযোগে মুষ্টিমেয় কয়েকজন অর্থ সঞ্চয় করিয়া জমি, মূলধন এবং শ্রমিক দলের মালিক হইয়া বসিয়াছেন।

ভারতের প্রকৃত অবস্থা যে কি তাহা আজ খুব কম লোকেই জানেন। প্রতিটি জনসভায় নানা প্রবন্ধে দেশী ও বিদেশী বণিকদিগের বিবৃতিতে আমাদের দেশের পাওনার কথাই আমরা কেবল শুনিতে পাই এবং তাহাতে জনসাধারণের একটি ধারণা জন্মিয়াছে যে, ভারত এই যুদ্ধে একটি পাওনাদার দেশে উন্নীত হইয়াছে। কিন্তু সত্যই কি তাই? যাহারা ভারতকে পাওনাদার দেশ বলিয়া প্রমাণ করিতে চান তাহারা তাহাদের নজীর হিসাবে দাখিল করেন ষ্টার্লিং ব্যালান্স ও ডলার পুলের টাকা। কিন্তু এই ১৬৮৫ কোটি টাকার ষ্টার্লিং ও সামান্য ডলারের পরিবর্তে ভারত সরকারের আছে এক প্রচণ্ড ঋণ ভার। ১৯৩৮ সালে যেখানে কর বাবদ ভারত সরকারের আয় ছিল ৮৪ কোটি টাকা, ১৯৪৪ সালে সেই বাবদ আয় দাঁড়াইয়াছে ৩০৮ কোটি টাকা। তবু এই টাকা সামরিক ব্যয়ের পক্ষে যথেষ্ট নহে, এবং সেই ব্যয়ের জন্য ভারত সরকারকে ঋণ পত্র বিক্রয় করিতে হইয়াছে আরও ৩০০ কোটি টাকার। ১৯৩৮-৩৯ সালের শেষে ভারত সরকারের ঋণের পরিমাণ ছিল ১,১৫৮ কোটি টাকা। কিন্তু তাহাই বাড়িয়া যুদ্ধের শেষে ১৯৩০ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালের শেষে ভারত সরকারের মোট ১১৫৮ কোটি টাকা ঋণের মধ্যে ষ্টার্লিং ঋণের পরিমাণ ছিল ৪৪৫ কোটি টাকা, টাকা হিসাবে গৃহীত মেয়াদী ঋণ ও ট্রেজারী বিলের পরিমাণ ছিল ৪৮৪ কোটি টাকা এবং বাকী ২২৯ কোটি টাকা ছিল আন্‌ফাণ্ডেড্ ডেট্। বর্তমান ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে ভারত সরকারের যে ১৯০০ কোটি টাকা ঋণ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ষ্টার্লিং ঋণ ৩৯ কোটি টাকা, টাকা হিসাবে গৃহীত মেয়াদী ঋণ ও ট্রেজারী বিল ৫৭১ কোটি টাকা, এবং ৩২০ কোটি টাকা আনফাণ্ডেড্ ডেট্ বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে। এইরূপে দেখা যায় যুদ্ধের সময়েতে ষ্টার্লিং ঋণের পরিমাণ হ্রাস পাইলেও ঋণ বৃদ্ধির পরিমাণ মোট ৭৭২ কোটি টাকা।

আবার এই যুদ্ধের সময় ভারত সরকার স্বর্ণের জামিন বিহীন অবস্থায় যে অবাধে ১২ শত কোটি টাকার নোটের প্রচলন করিয়াছে, তাহাও আমাদের গণ্য করিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে ইহা পরোক্ষভাবে ঋণ ছাড়া আর কিছুই নয়। এদিকে আবার দেখিতে পাই ঋণ ও ইজারা আইন বলে আমাদের নিকট আমেরিকার পাওনা হইয়াছে ২০৩ কোটি ২৩ লক্ষ ডলার বা ৬৫০ কোটি টাকা। আমাদের অর্থসচিব স্যার রোনাণ্ডস্ তাহার বাজেট পেশ করিতে গিয়া এবৎসর নতুন ৩০০ কোটি টাকা ঋণের কথা শুনাইয়াছেন। এখন যদি বিভক্ত সংখ্যাগুলির সমষ্টি করিয়া দেখি, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব দেনার কোঠায় ৪০৮০ কোটি টাকা এবং পাওনার কোঠায় ১৬৮৫ কোটি টাকা এই সকল বিবেচনা করিলে ভারতকে প্রকৃতপক্ষেই দেনাদার দেশ বলিয়া ধরা যায়। কারণ তাহার উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং ১৬৮৫ কোটি টাকার মধ্যেও অনেক অনাদায়ী থাকিবে বলিয়া মনে হয়।

বৃটন উডস্ চুক্তি বর্তমানে জনসাধারণের সম্মুখে একটি সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে। এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করা

রঙই বর্ত্তমান থাকায় আমাদের নিকট সাদা মনে হয়। এই পরীক্ষা থেকে বুঝা গেল যে একটি রঙের মধ্যে অন্য রঙ্-ও থাকতে পারে।

মানুষের চোখের ভিতর বিভিন্ন রঙের আলো গ্রহণের জন্য তিনটি যন্ত্র আছে। এই যন্ত্রগুলি প্রায় সকল রঙের আলোতেই সাড়া দেয়। লাল, বেগুনী এবং সবুজ রঙের আলো এই যন্ত্রগুলিকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উত্তেজিত করে। এই তিনটি যন্ত্রের উত্তেজনার সমষ্টি আমাদের নিকট একটি বিশেষ রঙ্-রূপে প্রকাশ পায়। কোনও ব্যক্তির যদি একটি যন্ত্র বিকল হয়—তবে সে-কয়টি রঙের অস্তিত্ব জানতে পারবে না। এরূপ ব্যক্তিদের আমরা 'রঙ্-কানা' বলে থাকি।

মাটির মায়া

কল্পনা নাগ—চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী

মঙ্গলগ্রহের তরুণসংসদের বৈঠকে সেদিন প্রৌঢ় পরিব্রাজক ওঙ্কারনাথের নিমন্ত্রণ। তিনি পৃথিবীভ্রমণ ক'রে সবে ফিরে এসেছেন। তাঁর অভিনব অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে টাটকা রচনা 'পৃথ্বিচারীর ডায়েরী'খানা প'ড়ে শুনিয়ে তিনি পরম আত্মপ্রসাদের দৃষ্টি মুগ্ধ সভ্যদের ওপর দিয়ে একবার বুলিয়ে নিলেন। সভাটি নিস্তব্ধতায় থম্‌থম্ করছিল।

চমক্‌প্রদ প্রবন্ধখানা পড়া শেষ হবার খানিক পরে তরুণসংসদের সাহিত্যশাখার পরিচালিকা গোধূলীর চোখ দু'টি হঠাৎ চক্‌চকে হ'য়ে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে উদয়ের দিকে ফিরে তাকালো। উদয়ও উজ্জ্বল চোখে ওর দৃষ্টির জবাব দিয়ে উঠে দাঁড়ালো :—

'শ্রদ্ধেয় ওঙ্কারনাথের ডায়েরী তোমরা সবাই শুনলে। আজব সহর ক'লকাতা সম্বন্ধে উনি সামান্য আভাসমাত্র দিয়েছেন, মনে হচ্ছে ক'লকাতার মাটিতে উনি পা দেবার সময় পান নি। তাই দূর থেকে গুজব শুনে ক'লকাতার আগে আজব বিশেষণটি বসিয়েছেন। যদিও পৃথিবীতে যাওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং ওঁর মতে ফিরে আসাটা আরো দুরূহ ব্যাপার—উনি নাকি একমাত্র বৈজ্ঞানিক শক্তির বলেই আসতে পেরেছেন—তবু আমি নিজে একবার ক'লকাতায় যেতে চাই; আর ফিরে এসে তোমাদের ওঁর চাইতেও ভালো গল্প শোনাতে পারবো ব'লে ভরসা দিতে পারি। কেন না ওঁর অভিজ্ঞতা শুধু মাথার, আমি তার সঙ্গে মনও মেলাবো। ভাইবোনরা, আশা করি তোমরা আমায় সমর্থন করবে।'

প্রকাশ্য সভায় এরকম গালাগালি খেয়ে ওঙ্কারনাথের মত মানী লোক আমাদের দেশে কী করতেন জানি না, তবে মঙ্গলগ্রহে তো সত্যি কথায় অপমান বোধ করার রেওয়াজ নেই, তাই ওঙ্কারনাথ বললেন,—'তোমার ওপর আমার বিশ্বাস আছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তো আমার নেই, একা একা যাওয়া কি ঠিক হবে?'

এ পাশের চেয়ার থেকে চট্ ক'রে উঠে দাঁড়ালো গোধূলী—'আমরা দু'জনে এক সঙ্গে থাকলে কোন বিপত্তির ভয়ই কেউ করবে না।'

এবার ওঙ্কারনাথ সহাস্যে অনুমতি দিলেন।

• • •

ক'লকাতায় এসে গোধূলীর সমস্ত গাম্ভীর্য কোথায় উড়ে গেল। উদয়ও কুতূহলী দৃষ্টিতে দেখে দেখে সহর ভ্রমণ করতে লাগলো। ওরা হাঁটতে হাঁটতে দক্ষিণপাড়ায় নিরিবিলি অঞ্চলের এক ছোট্ট দোকানে এসে দাঁড়ালো। উদয়ের তারুণ্যে-ঝলমল মুখে খুসির আমেজ লেগে ছিল। উপচে পড়া আনন্দ নিয়ে বললো,—'এগুলি বুঝি পান? খুব ভালো ক'রে তৈরী ক'রে দাও না, খেয়ে দেখি।'

গোধূলী দেখলো—পানওয়ালী একটি কিশোরী মেয়ে, মধুর লাবণ্য তার প্রতিটি অঙ্গে। মেয়েটিও অবাক হ'য়ে

রঙ্-এর রহস্য

সুনীল দাশ গুপ্ত—চতুর্থ বর্ষ, বিজ্ঞান

প্রকৃতির সৃষ্টি কি অপূর্ব। চোখ খুললেই চতুর্দিকে আমরা রঙের ছড়াছড়ি দেখতে পাই। নীল আকাশের নীচে, সবুজ গাছপালার মধ্যে সকলেই বাঁচতে চায়। প্রজাপতির রঙ্গিন পাখা কোন্ মানুষকে মুগ্ধ না করে? সমুদ্রের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে যখন দেখা যায় ছোট ছোট ঢেউগুলির উপর সূর্য্যকিরণ পড়ে' নানা রঙের মায়াজাল সৃষ্টি করেছে—তখন হৃদয় কি আনন্দে নেচে ওঠে না? প্রভাতের এবং সন্ধ্যার রক্তিম সূর্য্য কার মনে না আনন্দের সঞ্চার করে? বস্তুতঃ পৃথিবীতে নানা রঙের সমাবেশ যেন আনন্দের জীবন আনন্দময় করে তুলেছে।

সূর্য্যের আলো সাদা। নিউটন আবিষ্কার করেন যে সূর্য্যের সাদা আলো সাতটি বিভিন্ন রঙের আলোর সংমিশ্রণে সৃষ্ট হয়েছে। সূর্য্যের সাদা আলো-কে একটা কাঁচের প্রিজ্ম্-এর ভেতর দিয়ে প্রবেশ করালে তা সাতটি বিভিন্ন রঙের আলোতে বিভক্ত হয়ে পড়বে—তাদের পথে যদি অন্য একটা প্রিজ্ম্ উল্টো করে ধরা যায় তবে দেখা যাবে যে ঐ সাতটি বিভিন্ন রঙের আলো পুনরায় একত্র হয়ে সাদা আলো তৈরী হয়েছে। সুতরাং এই সাতটি রঙের আলো—সাদা আলোর মূল উপাদান।

কোনও না কোন রঙ্ নষ্ট করার ক্ষমতা প্রায় সকল বস্তুরই থাকে। কিরণচিত্রের সাতটি রঙ্গিন আলোর পথে যদি একটা লাল রঙের কাঁচ রাখা যায় তবে দেখা যাবে যে শুধুমাত্র লাল রঙের আলোই কাঁচ ভেদ করে আসতে পারছে, অন্য ছয়টি রঙ্গিন আলো তা পারছে না—অর্থাৎ লাল কাঁচটি অন্য রঙের আলো নিজের মধ্যে ধরে রেখেছে বা নষ্ট করে ফেলেছে;—এটাই হল রঙ্গিন বস্তুসমূহের রঙের মূল তত্ত্ব। পরীক্ষাটি দ্বারা এই সিদ্ধান্তই করা যায় যে, রঙ্গিন বস্তু সূর্য্যের সাদা আলো থেকে নিজের রঙ্ ভিন্ন অন্য রঙ্গুলি নষ্ট করে ফেলে। বেগুন দেখতে বেগুনী-রঙের, কারণ বেগুনের এমন ক্ষমতা আছে যার বলে সূর্য্যের আলোর অন্যান্য রঙ্গুলি নষ্ট করে বেগুনী রঙের আলো চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত করে। যে বস্তুর সকল রঙ্ নষ্ট করবার ক্ষমতা আছে, তাকে আমরা কালো দেখি। সূর্য্যের সাদা আলোতে যে সব রঙ্ বর্ত্তমান আছে, কৃত্রিম আলোতে সে সব রঙ্ না-ও থাকতে পারে। প্রদীপের আলোতে নীল রঙ্ নেই—সুতরাং নীল রঙের কোন বস্তু প্রদীপের আলোর সকল রঙ্ নষ্ট করে ফেলবে—যার ফলে সেটার রঙ্ হয়ে যাবে কালো। পরীক্ষাটি দ্বারা এই প্রমাণ হয় যে, কোনও বস্তুর রঙ্ যে আলো দ্বারা আলোকিত হয়, তার উপরেও নির্ভর করে।

নীল রঙের এবং পীত রঙের আলো যদি একটা সাদা পর্দ্দার উপর ফেলা যায় তবে দেখা যাবে যে, দুটি বিভিন্ন রঙ্ মিলে সাদা রঙের সৃষ্টি করেছে। অপরপক্ষে সাদা আলোর সম্মুখে যদি যথাক্রমে নীল ও পীত রঙের দুটি কাঁচ ধরা যায় তবে তাদের মিলিত প্রতিক্রিয়ার ফলে সবুজ রঙের উৎপত্তি হবে। এবার দেখা যাক্ কি প্রকারে সবুজ রঙের সৃষ্টি হ'ল। বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করেছেন কিরণ চিত্র থেকে লাল রঙ্ বাদ দিলে অন্য ছয়টি রঙ্গিন আলো মিলে নীল রঙের সৃষ্টি করতে পারে। সাদা আলোর সম্মুখে নীল কাঁচটি রাখবার ফলে লাল রঙ্ নষ্ট হয়ে যাবে—অর্থাৎ যে আলো কাঁচের ভিতর দিয়ে বাইরে আসবে তার রঙ্ হবে নীল। অপরপক্ষে পীত কাঁচটি সাদা আলোর নীল অংশ নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পারে। এখন যথাক্রমে এই দুইটি কাঁচ সাদা আলো থেকে লাল ও নীল অংশ নষ্ট করে ফেলবে; বাকী অংশটা সবুজ-প্রধান থাকায় সবুজ দেখাবে। প্রথম পরীক্ষাটিতে ব্যাপার সম্পূর্ণ অন্যরূপ ছিল। এক্ষেত্রে বর্ণকিরণ থেকে লাল ও নীল রঙ্ নষ্ট করা হয় নি। নীল রঙের কাঁচটি লাল রঙ্ নষ্ট করেছিল এবং লাল রঙ্ পীত কাঁচটি ভেদ করে পর্দ্দায় পৌঁচেছে, সুতরাং মিশ্রিত আলোতে সাতটি

ছাড়িয়ে যেতেই ডাক শুনলো, 'একটা পান খেয়ে যান।' জিনিষটা গোধূলীর বিশেষ প্রিয় ছিলো না, কিন্তু এই অনুরোধকে অবজ্ঞা করতে মন চাইলো না। দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ গল্পও করলো। আসার সময় ওকে পয়সা রেখে আসতে দেখে মেয়েটির মুখের সমস্ত তৃপ্তি যেন পরিণত হোল আকুলতায়—'না না, তা কিছুতেই হয় না।'

গোধূলী ওর প্রীতিকে মর্যাদা দিয়ে তুলে নিলো পয়সা। কিন্তু সারাটা রাস্তা বড্ড মন কেমন করতে লাগলো। আচ্ছা এ রহস্যের মানে কি? ওর মনে একটা অদ্ভুত কথা জাগছে কিন্তু তাও কি সম্ভব?

বাড়ী এসে গোধূলী বলে, 'কী চমৎকার সরল মেয়েটি ঠিক যেন আমাদের দেশের মত। এখানকার আবহাওয়ায় ওকে মানায় না। এদিকে সবাই যেন যন্ত্র, প্রাণহীন কলের মত জীবন এদের। আর মেয়েরা যেন সাজানো দোকান। কত হৃদয়হীনতা, মনুষ্যত্বের কত অপমান যে চোখে পড়লো ক'দিনে। আমার শ্রান্তমন জুড়িয়ে গেল মেয়েটির মুহূর্তের সাহচর্যে। জানো উদয়, আমার কেবলি মনে হচ্ছে ও তোমাকে ভালোবেসেছে।'

উদয় বাধা দ্যায়—'কী যে বলো। তোমার অনুভূতি প্রবল জানি, কিন্তু এখানে এসে তোমাকে সাহিত্যিকতা পেয়ে বসলো নাকি?'

গোধূলী—'না না, আমি সত্যি বলছি। তুমি তো এসব ছোটখাটো ব্যাপারে গভীরভাবে দৃষ্টি দাও নি, তাহ'লে বুঝতে পারতে।'

উদয়—'তাহ'লে চলো এবার মঙ্গলগ্রহে ফিরে যাই। আমরা তো পৃথিবীর জীব নই। কেন মিথ্যে একটা সুন্দর সরল মনে বেদনা জাগাবো! দু'দিন অন্যদিকে থেকে আর একটু দেখে শুনে শিগ্‌গির-ই চ'লে যাবো। কেমন?'

* * *

'এখানকার 'পুষ্পবীথি' তোলপাড় ক'রে লাভ করা যায় কাগজের ফুল। 'অমরাবতীর' যে শ্রী তাতে নরকের কীট হয়তো আরাম পেতে পারে, ইন্দ্রদেব দৈবাৎ এখানে এলে তাঁর অমরাবতী দেখে হয়তো অজ্ঞান হ'য়েই যাবেন। কত আর বলবো। বিয়ের জন্য এখানে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। মানুষ আপন আপন জাঁকজমক দেখাতে এত সচেষ্ট যে আমার হাসি সামলাতে কষ্ট হয়। শুধু গলাবাজি আর গলাবাজি। যেন ক'লকাতাব্যাপী বিরাট একটা নীলামের দরহাঁকা চলছে, যে যতবেশী হাঁকতে পারবে—ভেতর ফাঁপা হ'লেও—তারই জিত। তারপর কী অদ্ভুত ছাখো গোধূলী, চরম ঐশ্বর্য আর অনুপম দৈন্য এখানে পাশাপাশি। কেউ কেউ খেতেই পায় না আর চোখের সামনে তার বিলাসিতার দোকান সাজানো। চোখ ঝলসানো চাকচিক্যের ভেতর কানে এসে বাজে ব্যথিতের হাহাকার। বিংশ শতকের এ কী নিদারুণ অভিশাপ! এতদিন এদের ভেতর ঘুরে বেড়িয়ে এই আমি জেনেছি গোধূলী। আশ্চর্য কথা শোন, বিজ্ঞান এখানে ব্যবহার করা হয় মারণযন্ত্র আবিষ্কারে, কল্যাণের পথ খুব কম বিজ্ঞানীই গ্রহণ করে। এ তো পৃথিবীর বৈশিষ্ট্য নয়।'

'বড় অসামঞ্জস্য, না উদয়? এখানকার রাহাবেশীর অন্তরে রয়েছে ভিখিরির হ্যাংলামি। আর—'

কথাটা শেষ হোল না। ওরা গল্প করতে করতে ক'লকাতার সবচেয়ে বড় চৌরাস্তাটি পার হচ্ছিল এমন সময় হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে উদয় ছিট্‌কে ফুটপাথের ওপর গিয়ে পড়লো। গোধূলী ছিলো আগে আগে। ছুটে গিয়ে তুললো ওকে। উদয় ধুলো ঝেড়ে উঠেই ব্যস্ত হ'য়ে জিগ্যেস করলো, 'ওর কি হোল গোধূলী?'

'—কার?—'

সঙ্গে সঙ্গে একটা মিলিটারী জীপ চ'লে গেল;—রাস্তার ওপর আদ্ধেক গুঁড়ো হ'য়ে যাওয়া এক নারীদেহ। ধরাধরি ক'রে তুলে নিয়ে এলো ওকে। রাস্তায় ভীড় জ'মে গেল। মুখটা দেখে গোধূলী চম্‌কে উঠলো—'উদয়, যা বলছিলে, এখানকার গাড়ী এমন সুন্দরকেও পিষে যায়।—কিন্তু এখানে ও এলো কেন?'

এতক্ষণে একটা নিঃশ্বাস ফেলে উদয় জবাব দিলে, 'আমায় বাঁচাতে।'

তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ; এত সুন্দর এমন দৃপ্ত চেহারাও কারুর হয়! তার দোকানে কত খরিদ্দার রোজ যায় আসে, এমনটি আর চোখে পড়ে নি।—সে তারপর প্রাণঢালা দরদ দিয়ে সেজে দিলো দু'টি পান।

তারপর বড় রাস্তায় নামতেই চোখে পড়লো, বিরাট একটা বাড়ীর মাথায় ঝুলছে একটা স্কুলের বিজ্ঞাপন। লেখাটা প'ড়ে উদয় তো হেসে গড়িয়েই পড়লো।—

'দেখছো কাণ্ড! রংচঙে বিজ্ঞাপনে প্রলোভন দেখিয়ে ছেলেদের ডাকতে হ'লে তো বিপদের কথা। বিদ্যাকে যদি কষ্ট ক'রে আয়ত্ত করতে না হয় তবে তা জীবনে কি ক'রে ধন্য হ'য়ে উঠবে, বলো?'

গোধূলী বললো, 'ওঙ্কারনাথের পৃথিবী বর্ণনায় যা শুনেছি সে তুলনায় আমাদের দেশকে ঐশ্বর্যের রাজপুরী বললেই চলে, কিন্তু আমরা তো বিত্তকে রাস্তায় কুড়িয়ে পাই না, তাকে রীতিমত অর্জন ক'রে নিতে হয়।

উদয় জবাব দিলো, 'তবু আমি মুগ্ধ হচ্ছি গোধূলী। মনে হচ্ছে এ আমারি দেশ; যত অসঙ্গতি এর, সবদিকে তাকে পূর্ণ ক'রে তুলতেই যেন আমাদের আগমন।'

একটা নিঃশ্বাস পড়লো গোধূলীর। 'চলো উদয়, এগিয়ে যাই—' ব'লে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে চোখে পড়লো একটা দোকান, নাম লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। কি অদ্ভুত ভাঙ্গা নোংরা ঘর। দরজার নীচে তক্তার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ছোট্ট একটা ময়লা গামছায় মাথা মুছছে এক কঙ্কালসার ভদ্রলোক। সন্তর্পণে ক'রে উঠে যে কাপড়টি সে পরেছে তাতে লজ্জানিবারণ চলে মাত্র। সব জড়িয়ে দোকানটির এই অপূর্ব শ্রী। বাইরের প্ল্যাকার্ডে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' জলজল করছে।

—পরদিন। সহরের অন্য এক প্রান্ত। এদিকে সারি সারি নোংরা ঘিঞ্জি বস্তি। ভেতরে মূর্তিমান দৈন্যের অবাধ রাজত্ব। অভাবের তীব্র তাড়নায় বাসিন্দেরা অমানুষ। তারা তখন এক টুকরো পেঁয়াজ নিয়ে তুমুল কলহ তুলেছিল। এদের ভাষা ব্যবহার শুনে গোধূলী কানে আঙুল দেবে কি, আশ্চর্য স্তব্ধতায় ও একদম আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল। এতগুলি মানুষ, আর গরু-মোষ ওইটুকু-টুকু ঘরে কী ক'রে যে থাকে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

এ পল্লীটি পেরিয়ে এসে উদয় এতক্ষণে একটা কথা বললো—'আচ্ছা এসব দেখে তোমার কি মনে হয় না, এখানে আমাদের অনেক কিছু করবার আছে? এত করুণ এ পৃথিবী, এতে আমরা বিপ্লব আনবো না?'—

বিকেলে চোখে পড়লো একটা দোকান। উদয় বললো, 'চলো অমরাবতীর ভেতরটা একটু দেখে আসি।'

গোধূলী জবাব দিলো, 'তুমি ঘুরে এসো। আমাকে সেদিনকার সেই পানের দোকানের সামনে খুঁজে পাবে।'

দোকানটির সামনে এসে গোধূলীর মনে হোল কয়েকটা পান কিনলে হয়। উদয় তো পথে বেরিয়ে আজকাল রোজই পান খাচ্ছে।

অশিক্ষিত কিশোরী চিনলো গোধূলীকে। পরিচিত হাসি ফুটে উঠলো তার ঠোঁটে।

রাস্তায় এসে নামতেই উদয় এসে পাশে দাঁড়ালো। গোধূলী ফিরে দেখলো পানওয়ালী নতুন এক উদাস দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়েছে উদয়ের পিঠের ওপর। সে চাউনিতে ও অবাক হোল। বুকের ভেতরটা কেমন উদ্বেল হ'য়ে উঠলো। টেনে নিলো উদয়ের হাতটা।

—এই রাস্তাটির নিরিবিলি, দুধারের দারুণ কৃষ্ণচূড়ার সবুজ লালিত্য আর বিশাল ঝরণাধারা, গাছগুলির ঝিরঝিরে পাতা—সব জড়িয়ে এক করুণ মাধুর্য গোধূলীর ভালো লেগেছিলো। যখন খুশী সে পারতো দূর দিগন্তের অসীম নীলিমার সঙ্গে তার দৃষ্টি মিলিয়ে দিতে—যে সুবিধে সহরের অন্যত্র ছিল না। তাই কিছুদিনের জন্য ওদের আস্তানা পড়লো এখানেই। এবার কখনো কখনো ওরা বেড়াবার সময় আলাদা হ'য়ে পড়তো। উদয় চ'লে যেতো ধনীবসতি অঞ্চলে; আর গোধূলী কাছাকাছি এ পাড়ায় ও পাড়ায়, বাজারের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াতো। বাসায় ফেরার পথে প্রায়ই চোখাচোখি হোত পানওয়ালীর সাথে। হাসতো দু'জনেই, কচিৎ দু'একটা কথাও না হোত তা নয়। একদিন কেন যেন গোধূলী দোকানটি

দাঁড়াল। "মিস বোস"—ফিস ফিস কতকগুলি স্বর এক সঙ্গে বলে উঠলো। হাতের সিগারেটটা দূরে ছুঁড়ে দিল স্বপন।

'Well, কি করব জিজ্ঞাসা করছিলে না? Let's follow her"—স্বপন বলে উঠল। রমেন বলল, "কিন্তু কোথায় যাচ্ছে না জেনে"—

"Oh rotten! Let her go to hell—We'll follow her"—দূরে একটা ট্রাম দেখা গেল। স্বপন সিগারেট ধরাল আর একটা। ট্রাম এসে গেল।

—"ট্রামে চড়বো? Cad! চলো ট্যাক্সি করে যাবো। ও যাক ট্রামে"—

মেয়েটী লঘুপায়ে উঠে পড়ল।

"আরে! পিছনে তাকিয়ে দেখল যে?" অমর টিপ্পনী কাটল।

"Ah! then we are lucky!" নাটকীয় ভঙ্গীতে স্বপন বলল। দূরে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল। চারজনে তাতে উঠে পড়ল। ট্যাক্সি ছুটল ট্রামের পিছনে।

.........আপনাদের কাছে হয়তো এদের রুচি বিকৃত মনে হবে। কিন্তু স্বপনের দেখা আপনারা রোজই পাচ্ছেন। ট্রামে, বাসে, পথে, ঘাটে শত শত স্বপন শুধু খেয়ালের পিছনে ঘুরে বাপের টাকা উড়িয়ে দিচ্ছে। এদের সংখ্যা কম নয়।.........

[দ্বিতীয় চিত্র]

সরু গলি। দু'পাশে জমে ওঠা আবর্জ্জনার দুর্গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত। গলির একপাশে প্রকাণ্ড অট্টালিকা সূর্য্যের আলো আনাগোনা করবার পথ রুদ্ধ করে রেখেছে। আর এপাশে একটি বহু পুরাতন একতলা বাড়ী। বাড়ীটিতে ব্যবহার্য্য ঘর মাত্র একটি। ঘরটির এককোণে একটি জীর্ণ টেবিল ও হাতলভাঙ্গা চেয়ার। একটি যুবক সেই টেবিলে বসে নিজের মনে পড়াশুনা করছে। খালিগায়ে একটা চাদর জড়ানো—পরণে একটা জীর্ণ ধুতি।

সূর্য্য প্রায় অস্ত গেছে। ছেলেটি পাশের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। উপরে ছোট একফালি আকাশ অস্তগামী সূর্য্যের আভায় রক্তিম হয়ে উঠেছে—অনিমেষ, একদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইল। ঘরের মধ্যে ঘনিয়ে এল অন্ধকার। আকাশের রঙও পড়ে এল। কিন্তু অনিমেষ সেই একভাবে বসে রইল। কিছুক্ষণ পরে আবার যখন সে বইয়ের উপরে ঝুঁকে পড়ল, তখন কিছু দেখা যায় না। দেশলাই জালিয়ে কেরোসিনের বাতিটা ধরাল। তার সামনের ঘড়িতে ঘণ্টাগুলো পার হয়ে যেতে লাগল এক এক করে। ঘড়িতে প্রায় বারোটা বাজে এমন সময়ে ঘরের কড়া নড়ে উঠল। অনিমেষ উঠে দরজা খুলে দিতে একটী বিধবা মহিলা ঘরে ঢুকলেন. হাতে একটি থালায় ঢাকা দেওয়া কিছু খাবার।

—"এসেছো মা?"

—হ্যাঁ বাবা, আজ একটু কাজ ছিল, তাই দেরী হয়ে গেল। তোমার জন্যে খাবার এনেছি,—খেয়ে নাও।

অনিমেষ জানে, মা নিজে না খেয়ে তার জন্যে খাবার এনেছেন। বললে, "আমার খিদে নেই মা,—পেট একেবারে ভরে আছে।" মার চোখে আশঙ্কা ঘনিয়ে এল, তাড়াতাড়ি অনিমেষের কপালে হাত দিয়ে তাপ পরীক্ষা করে বললেন, "কিছু হয়নি তো? সারাদিন টিউশনি আর রাত জেগে পড়া, এ সহ্য হবে কেন?

অনিমেষ ম্লান হেসে বললে, "তুমি ভেবো না মা। আজ কলেজে এক বন্ধু খাওয়াল, তাই আর খিদে নেই।" অনিমেষ অম্লানবদনে মিথ্যা কথা বলে গেল। মা খাবারের থালাটা ঘরের এক কোণে রেখে দিলেন।

—"খাবারটা নষ্ট হয়ে যাবে মা, তুমি খেয়ে নাও।"

—"আমি খেয়ে এসেছি—"

—"তা হোক, আর একবার খাও।" অনিমেষ উঠে মার খাবার জায়গা করে, সামনে বসে তাকে জোর করে খাওয়াল। খাওয়ার পর, মাদুর পেতে মা শুয়ে পড়লেন।

ধীরে ধীরে চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে এল। কোথাও কোন আওয়াজ শোনা যায় না। শুধু গলির বাইরে বড় রাস্তার উপরে মিলিটারী গাড়ী যাতায়াতের শব্দ নির্জ্জনতাকে বাড়িয়ে তুলছে। অনিমেষের সামনে ঘড়িটা বেজে চলেছে

পানওয়ালী কুমারীকে বাঁচানো গেল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা গেল। শেষ চাউনিতে ওর কী তৃপ্তি মাখানো ছিলো তা গোধূলীর নারীহৃদয়ে ধরা প'ড়ে গেল।

দু'জনে ফিরে এলো আস্তানায়। গোধূলী উপুড় হ'য়ে শুয়ে পড়লো বিছানায়। একটা প্রচণ্ড আবেগকে ও যেন কিছুতেই দমন করতে পারছিল না। উদয় পাশে ব'সে আস্তে আস্তে কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

'গোধূলী, এ কী মায়ায় ও আমাদের বেঁধে গেল। মঙ্গলগ্রহে আর কী ক'রে ফিরে যাই বলো তো? ওর সারা দেশের দায়িত্বে আজ থেকে আমাদেরও অংশ নিতে হবে। এতদিনে সহরে যত অদ্ভুত অসঙ্গতি চোখে পড়েছে, এ দেশবাসীর চলার ছন্দে যত ভুল আমরা ধরতে পেরেছি, সব কিছুকে সব দিক দিয়ে প্রতিকার ক'রে সুষ্ঠু ভাবে গ'ড়ে তোলার ভার আমাদের। নতুন পথ প্রদর্শন করার ব্রত আজ থেকে আমাদের।'

চোখ দিয়ে বড় বড় দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো উদয়ের। গোধূলী উঠে ব'সে বললো, 'আমারো তাই মনে হচ্ছে। আমাদের জন্য প্রাণ দিয়ে, সঙ্গে ও আর যা দিয়ে গেল অন্তর দেবতার যে পরিচয় উদ্ঘাটিত ক'রে গেল, তার মর্যাদা আমরা রাখবোই, ওর ঋণশোধ করবো জীবনভর এই অভিনব ব্রত পালন ক'রে। যত বিপত্তি ঝড়ঝঞ্ঝা মাথার ওপর ব'য়ে যাক ক্ষতি নেই।—এখানকার নানা অদ্ভুত কাণ্ড দেখে বড্ড দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছিল। তা আর হোল না, উদয়।'

উদয়—'উঃ কে জানতো পৃথিবীতে এসে এমনিভাবে জড়িয়ে পড়তে হবে। যাক গে, চলো তবে গোধূলী, আমরা নতুন পথে বেরিয়ে পড়ি।—'

ছাত্র

ললিত সেন—চতুর্থ বর্ষ, সাহিত্য

[প্রথম চিত্র]

দুপুরবেলা। একটা জনবহুল রাস্তায় লোকের আনাগোনা কিছু কমে এসেছে। রাস্তার এপাশে একটা কলেজের অট্টালিকা চারতলা পর্য্যন্ত সোজা উঠে গেছে; আর ওপাশে ছায়াঘন মাঠ। মাঠের মধ্যে এখানে ওখানে ঘন গাছপালা। তার নীচের ঠাণ্ডা ছায়ায় বসে ছাত্ররা দল বেঁধে গল্প করছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় গাছের পাতাগুলি ঝির ঝির করে নড়ে উঠছে। রাস্তার মাঝখান দিয়ে ট্রাম লাইন। মাঝে মাঝে ট্রামের যাওয়া আসার শব্দ বেশ একটা স্বপ্নময় দ্বিপ্রহরের ভাব এনে দিয়েছে।

হঠাৎ কলেজ থেকে চারটী ছেলে গোলমাল করতে করতে বেরিয়ে এল। স্বপন, রমেন, নীরেন আর অমর। স্বপন বড়লোকের ছেলে। সৌখীন চেহারা আর পরিপাটী বেশভুষা দেখেই সেটা বোঝা যায়। পরণে নিখুঁত, নির্ভাঁজ স্যুট্। দু'আঙুলের ফাঁকে একটি জলন্ত সিগারেট। বাকী তিনজনের হাতেও সিগারেট পুড়ছে।

বর্ত্তমানে চারজনেই ক্লাস পালিয়েছে। এখন গোলমাল হচ্ছিল সময়টা কি করে কাটান যায় তাই নিয়ে।

রমেন বলল, "চল কফি হাউস, স্বপন খাওয়াবে।"

নীরেন বলল, "না, কফি হাউস বড় পুরাণ—চৌরঙ্গীর উপরে একটা ultra-modern রেস্তোরাঁ খুলেছে। American from top to bottom."

—"Cad"!—বলে উঠল স্বপন।

"কেন? কেন?"—বাকী তিনজনেই বিস্মিত।

"নতুন কিছু বল। ওসব বড় পুরাণ হয়ে গেছে—too hackneyed." হঠাৎ কলেজ থেকে একটি ছাত্রী বেরিয়ে এসে তাদের সামনে, ট্রাম দাঁড়াবার জায়গায়

২৩শে জানুয়ারী 'নেতাজী ভবনের' সম্মুখে
সমবেত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী।

২৬শে জানুয়ারী 'স্বাধীনতা দিবস' পালনে
সমবেত আশুতোষ কলেজের ছাত্রীবৃন্দ।

: আলোক-চিত্রশিল্পী :
সুনীল দাশগুপ্ত
চতুর্থ বর্ষ, বিজ্ঞান।

স্বর্গদ্বারে গঙ্গার দৃশ্য

—টিক্ টিক্—টিক্ টিক্—তাকিয়ে দেখল ছটো বেজে গেছে। মা অকাতরে ঘুমোচ্ছেন। আলোর শিখাটা কাঁপছে। অনিমেষ আবার পড়তে লাগল।

মা বিছানা থেকে উঠে এলেন।—"এবার শুয়ে পড়ো অনু।"

—"আর এক ঘণ্টা, মা।"

—"শরীর ভেঙ্গে পড়বে বাবা, এবার শুয়ে পড়ো।"

—"না পড়লে কি করে চলবে, স্কলারশিপ যে আমায় পেতেই হবে, মা। তুমি অন্যের বাড়ীতে রেঁধে বেড়াচ্ছ, এ আমি আর দেখতে পারি না।" অনিমেষের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এল। মা আঁচল দিয়ে নিঃশব্দে চোখের কোণ মুছে নিলেন। অনিমেষ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাইরের দিকে চাইল। কেরোসিন বাতির শিখাটা হঠাৎ দপ্ করে নিভে গেল।

—"আরে! নিভে গেল? একটু কেরোসিন, মা"—সেকেণ্ড চারেক চুপচাপ। অন্ধকার থেকে মার আর্ত্ত-কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "আর তো কেরোসিন নেই।"

—"নেই?—যাক ভালই হল"—অন্ধকারের মধ্যে অনিমেষের দীর্ঘশ্বাস মিশে গেল।

......গরম লেপের মধ্যে নিশুতিরাতে যখন হঠাৎ আমাদের ঘুম ভেঙ্গে যায়, তখন অন্ধকারের মধ্যে অনিমেষের নিষ্ফল দীর্ঘশ্বাস আমরা শুনতে পাই কি?......

[তৃতীয় চিত্র]

একটা ঘরে ক্লাস হচ্ছে—মধ্যবয়সী এক অধ্যাপক। পড়াতে পড়াতে এক সময় বলে উঠলেন, "আজকালকার ছেলেরা দিন দিন মেয়েলী হয়ে যাচ্ছে।"

পিছনের বেঞ্চে একটি ছেলে গল্পে মত্ত ছিল। হঠাৎ কথাটা কানে যেতেই সে লাফিয়ে উঠল।

—"আমি আপনার কথার প্রতিবাদ করছি স্যর।" অধ্যাপক একটু বিস্মিত হয়ে বললেন, "মানে?"

—"মানে, আপনি সমগ্র ছাত্র সমাজকে অপমান করেছেন—আপনি আপনার কথা ফিরিয়ে নিন।"

—"তোমাদের অপমান আমি করছি, না তুমি নিজে করছ?" অধ্যাপক একটু শ্লেষের হাসি হাসলেন।

ছেলেটা হঠাৎ তড়াক্ করে বেঞ্চের উপর লাফিয়ে উঠে চীৎকার করে উঠল—"অপমান করা"—

সকলে যোগ দিল "চলবে না!"

দ্বিগুণ উৎসাহে ছেলেটা বলল, "অপমান করা"

সকলে দোহার দিল "চলবে না!"

অধ্যাপক কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসে রইলেন, তারপর বিরক্ত হয়ে উঠে গেলেন। ছেলেটি দৌড়ে এসে প্লাট-ফরমের উপরে দাঁড়াল, তারপর হাত-পা নেড়ে চীৎকার করে বলতে লাগল, "বন্ধুগণ, ছাত্র-সঙ্ঘ হচ্ছে ছাত্রদের প্রকৃত প্রতিনিধি, কাজেই আমি সেই ছাত্র-সঙ্ঘের তরফ থেকে বলতে চাই—"। তার বলা আর হল না, কারণ আর একটা ছেলে এসে ততক্ষণে বলতে সুরু করেছে, "বন্ধুগণ, আপনারা সকলে জানেন, ছাত্র-সঙ্ঘ ছাত্রদের প্রকৃত প্রতিনিধি নয়, ছাত্র-সমিতিই একমাত্র সেই দাবী করতে পারে। কাজেই—"। একটা ছেলে এতক্ষণ নিদ্রাসুখ উপভোগ করছিল। গোলমালে তার ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু ব্যাপারটা বুঝে নিতে তার এক মুহূর্ত দেরী হল না। দৌড়ে এসে, বক্তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল, "রেখে দাও কথা, ছাত্র-সমিতি চলেন কিনা ছাত্রদের প্রতিনিধি—কাজ তো করেন ঘোড়ার ডিম! যদি সত্যই সে রকম কোন কিছু থাকে, তবে সে হচ্ছে ছাত্র-সমবায়।" ছাত্র-সঙ্ঘ, ছাত্র-সমিতি এবং ছাত্র-সমবায় এদের মধ্যে কে ছাত্র সমাজের প্রতিনিধি, তাই নিয়ে তুমুল বাক্‌যুদ্ধ চলতে লাগল—তার প্রচণ্ডতায় সমস্ত ঘর কাঁপতে লাগল। কিন্তু সেই মহামহিম নেতারা যদি লড়াইয়ের মাঝে একটু সময় পেতেন, তবে দেখতেন, যে ছাত্র-সমাজকে নিয়ে তাঁরা শক্তিক্ষয় করছেন, সেই ছাত্ররাই আর কেউ ক্লাসে নেই।

ছাত্র-সঙ্ঘ, ছাত্র-সমিতি এবং ছাত্র-সমবায়ের ছাত্ররাই চলে গেছে—লড়াই চলছে কেবল, সঙ্ঘ, সমিতি এবং সমবায়ের মধ্যে।

শাঁখা

মনোরঞ্জন জানা—চতুর্থ বর্ষ, সাহিত্য

সন্ধ্যা নেমে এল। অপরেশ বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে, শিথিল হয়ে এসেছে তার সমস্ত দেহ। দেহ নয়ত, কতকগুলো সজীব হাড়। বীভৎস! শরীরের সমস্ত শক্তিটুকু যেন গুটিয়ে এসে ঠেকে রয়েছে চোখের জলজলে দু'টি তারায় বাধা পেয়ে। কালো কালো কোটর থেকে উঁকি দেয় অভিশাপের মত। পদ্মা পাখা দোলান বন্ধ করে ধীরে ধীরে মশারী টানিয়ে দিল। গায়ে ঢাকা চাদরটা আর একটু টেনে দিল একেবারে চিবুক পর্য্যন্ত। কুলুঙ্গীতে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে বের করল একটা দিয়াশলাই। খুলে দেখে একটি মাত্র ভাঙ্গা কাঠি। সেই কবে কেনা হয়েছিল। তাই দিয়ে অতি সতর্কে প্রদীপটা জ্বালিয়ে নিল। সলতে শুকিয়ে গেছে, তেল নেই। ভাঁড় থেকে কয়েক ফোঁটা তেল ফেলে দিল প্রদীপের বুকে। সলতেটা নিঃশেষে তা শুষে নিয়ে সতেজ হয়ে উঠল।

পদ্মার সমস্ত দেহ ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়তে চায়। বাইরে এসে দাঁড়াল রেলিং-এ ভর দিয়ে। সন্ধ্যার বাতাস বিস্রস্ত রাশিকৃত চুল গুলিকে চঞ্চল করে তোলে। সামনের বাড়ীতে এক একটি করে আলো জ্বলে উঠল। ওখান থেকে ভেসে আসে ছেঁড়া খোঁড়া দু'একটা কথা, দেখা যায় অস্পষ্ট দু' একটা ছায়া-মূর্ত্তি।

আজ সে মনকে কিছুতে গুছিয়ে আনতে পারচে না, ছোট খাট বিচিত্রার মাঝে শতধা হয়ে যায়।

তখন বয়স সবে এগার কি বার। বড় আদরের, বাপ মায়ের একমাত্র মেয়ে। আপন গাঁয়ে বাপ মায়ের স্নেহ আদরে পুষ্ট হয়ে কখন্ বড় হয়ে উঠল। মায়ের চোখ ফুটল, খোঁচা দিয়ে বলল,—ওগো, মেয়ে যে তোমার বড় হয়ে উঠেছে—একেবারে কলা গাছের ঝাড় নিয়েছে, এবারে একটা বিয়ে থা'র জোগাড় দেখ। বাপের চমক ভাঙ্গল। দৃষ্টি পড়ল আশে পাশের ছয় সাতখানা গাঁয়ের ওপর, অমন মেয়ে সেখানে কোথাও নেই।

পাঠশালা যাওয়া বন্ধ করে, পুকুর সঙ্গীদের খেলার ডাক উপেক্ষা করে, আদরের পুতুলগুলিকে বিলিয়ে দিয়ে এসে দাঁড়াল মায়ের পাশে রান্না ঘরে।

বাপের অবস্থা ভাল নয়। সামান্য কয়েক বিঘা জমি। দু' একটা পুকুর, দু' জোড়া গরু, একটা লাঙ্গল। সম্পত্তি বলতে এই তার সব তবু অভাব তার কোনদিন হয়নি, উদ্বৃত্তও হয়নি। পুরাণ পেটরা হাতড়ে হাতে ঠেকল কয়েকটা টাকা, পয়সা, আনি, দুয়ানি। গুণে গুণে শেষে হতাশ হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

পাশের গাঁয়ে অমূল্য হাজরার ছেলে অপরেশ একদিন আপনি এসে পদ্মার বাবাকে জানাল, সে পদ্মাকে বিয়ে করতে চায়। বাপ মত দিয়ে বিয়ের কথা পাকা করে নিল। ছেলেটি ক'লকাতায় চাকুরী করে। ছুটি নেই হাতে। দু'টি মাস পরে বিয়ে করে, বিয়ের পরদিন অপরেশ দেশের ভিটা ছাড়ল। যাওয়ার বেলা মেয়ে বাপকে প্রণাম করতে বাপ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। পাড়ার লোকরা ভিড় করে সান্ত্বনা দিয়ে গেল। অমন সোনার চাঁদ ছেলে—তিনটে পাশ দিয়েছে। বড় চাকুরী করে। তোমার মেয়ের ভাগ্যি ভাল, নইলে অমন ছেলে দোর বয়ে কখনও আসে বিয়ে করতে। তা হয়ত বলতে পার অমূল্য হাজরার সম্পত্তি বলতে কিছু নেই। তা থাকবে কেমন করে বল। ঐ ছেলেটিকে পড়াতে ভিটে বাটি টুকুও তার বাঁধা দিতে হয়েছিল। তাতে আর কি, অমন একটি ছেলে লাখ টাকার সামিল।

এইটুকু তার বিয়ের আগের ইতিহাস। তারপর একটানা কেমন করে আট বৎসর কেটে গেল। আশ্চর্য্য! স্বামী চাকুরী করে ছোট খাট একটা অফিসে। সামান্য যা বেতন পায় তাতে কোনরকমে মাসটুকু পেরিয়ে যায়।

কংগ্রেস শিল্প প্রদর্শনী (বালীগঞ্জ)

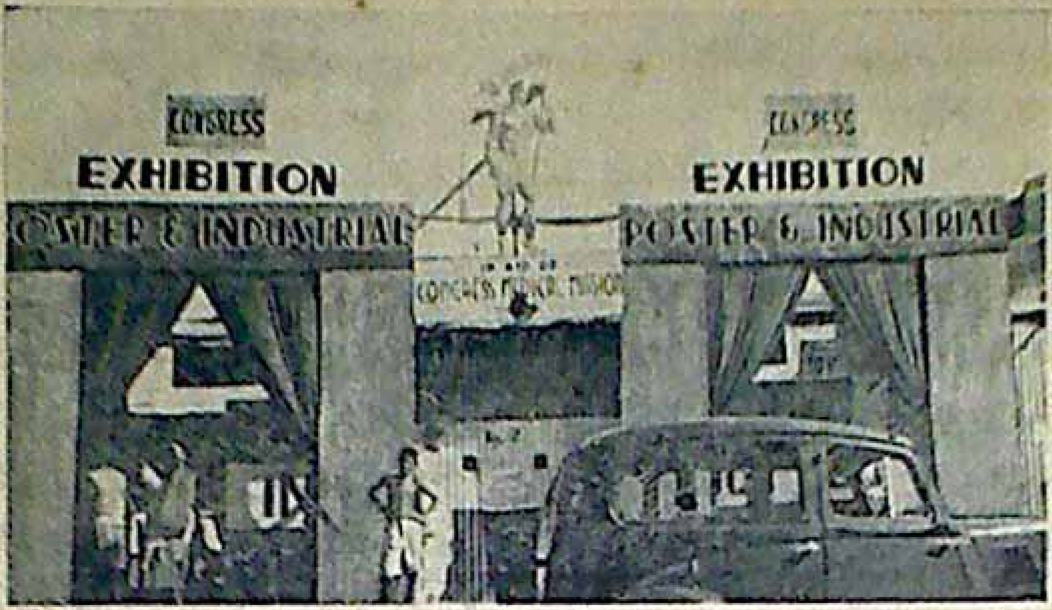

: আলোক-চিত্রশিল্পী :

রণজিত রায় চৌধুরী,

প্রাক্তন ছাত্র

প্রবল ঝড়ে বিধ্বস্ত প্রদর্শনী

প্রদীপটাকে বাঁ হাতে ধরে সে অন্য ঘরে বসে হাঁড়ির পর হাঁড়ি খুঁজে বেড়ায় যদি দু'একমুঠা চাল পাওয়া যায়। শেষে পেল মুঠা খানিক। আলোর সামনে এসে দেখে পোকা লেগে গেছে। তাই ঝেড়ে বাছতে বসল। একটি একটি করে বাছা সারা করে শিল-নোড়াতে গুঁড়িয়ে ফেলল। তাকেই জল দিয়ে গুলে অনেক কষ্টে উনুনে ফুটিয়ে স্বামীর মুখের সামনে এনে ধরল! স্বামী এক চুমুকে তা শেষ করে দিয়ে আবার এলিয়ে পড়ল।

সামনে দাওয়ায় বড় ছেলেটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে, চৌকাঠে মাথা দিয়ে। মাত্র ছটি বৎসর বয়স। বড় শান্ত, বড় স্থির। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কোন দিন কোন প্রতিবাদ জানায় নি। বেদনা-বিরস মুখে সকরুণ দুটি বড় বড় চোখ মেলে চেয়ে থাকে। মশারী নেই। যা আছে সেটা শতছিন্ন। পদ্মা রাত্রে শোয়ার পূর্ব্বে ছিদ্রগুলোতে একটি একটি করে কাপড় চাপা দেয়। ঝাঁকে, ঝাঁকে কোথা দিয়ে মশা ঢুকে পড়ে। বিরক্ত হয়ে মশারীটাকে হিঁচড়ে টেনে দূরে সরিয়ে দেয়। ছেলে দুটিকে সমস্ত রাত্রি একটা জীর্ণ পাখা দিয়ে বাতাস করে। ঘুম কখন্ এসে জোর করে চেপে দেয় চোখের দুটি পাতা। পাখাটা হাত থেকে সশব্দে পড়ে যায় মেঝেতে। পদ্মা গড়িয়ে পড়ে ছেলে দুটির পাশে। ঘুমের মাঝে অভ্যস্ত ডান হাতটা কেঁপে কেঁপে ওঠে।

পদ্মার চিন্তা আবার অন্যদিকে মোড় নিল। পাশের বাড়ীর পানওয়ালী ভাল নয়। কত মেয়ের নাকি সর্ব্বনাশ করেছে। মাঝে মাঝে দুই একটা লোককে ওখানে সে আসতে দেখেছে—তারা কী সব পরামর্শ করে। একদিন ঐ পানওয়ালী ওকে ডেকে কতগুলি কথা বলেছিল।—উঃ সে কথা মনে হলে আজও ওর বুক ভয়ে ঢিপ্ ঢিপ্ করে। স্বামীকে সব কথা খুলে বলেনি। শুধু বলেছিল,—ওগো দেখ, ঐ মেয়েটা কিন্তু ভাল নয়, কী সমস্ত বলে, ওকে পার না এখান থেকে উঠিয়ে দিতে?"

স্বামী তাকায় ওর মুখের দিকে, কাতর মিনতি ফুটে উঠেছে সেখানে। বলল,—উপায় নেই পদ্মা, আমাদের সব সয়ে যেতে হবে।

মনে পড়ে প্রথম প্রথম ও ছাদে উঠত কাপড় মেলতে, চুল শুকাতে। সামনে ঐ বিরাট পাঁচতলা বাড়ীর ছাদ থেকে উঁকি দিত একটি মুখ। তরুণ কামনায় লাবণ্যহীন। কুৎসিত ইঙ্গিতে হাতছানি দিতে দেখেছে। তার পর থেকে সে ছাদে ওঠা বন্ধ করে। নাম শুনেছে গিরীন বিশ্বাস, মস্ত বড়লোকের ছেলে। কী করে কে জানে। প্রায় সকল সময় ওকে সামনের রাস্তা দিয়ে বিরাট একটা গাড়ীতে চেপে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। গাড়ীটা ওর নিজের।

একদিন ঐ পানওয়ালীটা ওকে একটা চিঠি এনে দেয়। গিরীনবাবু চিঠি লিখেছে পদ্মার রূপে মুগ্ধ হয়ে। দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সে নাকি পদ্মার পায়ে জীবন সঁপে দিয়েছে—ধন যৌবন তার পায়ে লুটিয়ে দিয়েছে—ইত্যাদি আরও কতকি। পদ্মা চিঠি শেষ করতে পারে না। ঘৃণায়, ভয়ে সে শিউরে ওঠে। ছুটে গিয়ে জ্বলন্ত উনুনের মাঝে চিঠিটাকে ফেলে দেয়। ফস্ ফস্ করে জ্বলে উঠে মুহূর্ত্তে ছাই হয়ে যায়। পদ্মার বুক সাফ করে বেরিয়ে আসে একটা স্বস্তির নিশ্বাস। খামের মধ্যে খুঁজে পায় একশত টাকার পাঁচখানা নোট! পদ্মা পানওয়ালীর মুখের সামনে পাঁচখানা নোট ছুঁড়ে দিয়ে একরকম ছুটে ঘরে আসে। বিছানায় ছোট ছেলেটা ঘুমিয়ে। তাকে প্রাণপণে বুকের মাঝে জড়িয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে। বাইরের লোকের কী অধিকার আছে তাকে এমন করে অপমান করবার? এর কি কোন প্রতিকার নেই? কেঁদে কেঁদে কখন ঘুমিয়ে পড়ে, ঘুম ভাঙ্গে স্বামীর ডাকে।

আজ নিস্তব্ধ রাত্রির বুকে ক্ষীণ প্রদীপের আলোর সামনে বসে ওর সে সব কথা ভাবতে হাসি পেল। প্রদীপের শিখা আর একটু বাড়িয়ে দিতে অনেকটা জায়গা আলো হয়ে উঠল। ঘরে এসে আয়নাটাকে ভিজে গামছা দিয়ে বার কয়েক মুছে নিল। মুখের সামনে প্রদীপ ধরে স্থির দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল আয়নার দিকে। চোখের কোণে কালি পড়েছে, কালো কালো

সংসার বাড়ল; দুটির জায়গায় হ'ল চারটি। বেতন সে অনুপাতে বাড়ল না। প্রয়োজনটাকে তাই আরও সংক্ষেপ করে আনতে হল। কাপড় চারটির জায়গায় হ'ল দুটি; জামা দুটির জায়গায় হ'ল একটি; ভাড়াবাড়ীর তিনটি ঘরের জায়গায় হ'ল দুটি ঘর। চাকরটিকে একদিন পদ্মা জবাব দিয়ে বসল। স্বামী প্রথম প্রথম খুঁতখুঁত করত। ক্রমে সব সয়ে এল। পরিবর্তে বাড়ল একটা বিছানা, দুধ আধসের, মাসে মাসে আসতে লাগল দু' একটিন বার্লি, এক আধপোয়া মিছরী। দাওয়ায় টাঙান দড়িতে ঝুলতে লাগল দু'একটা ছেলেমেয়ের জামা। আর সবচেয়ে বেশী বাড়ল পদ্মার কাজ। অর্থের মন্থর স্রোতে সংসার তরীটাকে কোন রকমে মাথা ঝুঁকিয়ে পদ্মা আর তার স্বামী গুণ টেনে চলতে লাগল। মাঝে মাঝে হয়ত চোরা-কাঁটায় পা যেত ক্ষতবিক্ষত হয়ে, দড়ির ঘষা লেগে হাত যেত কেটে, হয়ত রক্ত পড়ত, কিন্তু নৌকো এগুতো।

তারপর একদিন পদ্মার স্বামী পড়ল অসুখে, বেশ ভারী অসুখে। গুণ গেল ছিঁড়ে, নৌকা চলা বন্ধ হল। ডাক্তার দেখাতে, ওষুধের খরচ জোগাতে জমান যা কিছু টাকা ছিল নিঃশেষ হয়ে গেল। গহনা-পত্তর বিক্রি করতে করতে ঠেকল একখানি শাঁখাতে। ছেলের পড়ান বন্ধ হ'ল, বেতন আর জোগান চলছে না। সমতা রক্ষা করে স্বামী কিন্তু সুস্থ হয়ে উঠল না, অধিকন্তু প্রাণশক্তি দিনে দিনে কমে আসতে লাগল। কয়েক দিন ডাক্তার আসা বন্ধ হয়েছে—টাকা নেই, কেমন করে ডাকবে—কেমন করে জোগাবে ওষুধ আর পথ্য! আজ দুদিন ধরে ছেলেটাকে শুধু ফেন-নুন গুলিয়ে খেতে দিয়েছে। পাশের ছোট ঘরটাতে থাকে একটা পান-ওয়ালী। সেই কাল সকালে আধসের চাল দিয়ে গেছল, তাই চাটি চাটি করে দুবেলা ফুটিয়ে খেয়েছে আর ছেলেকে খাইয়েছে। বুকের দুধটুকু শুকিয়ে গেছে। সাত মাসের ছোট মেয়েটাকে সে কী খেতে দেবে। আহা, অমন সুগোল মাংসল চেহারাটা না খেতে পেয়ে চুপসে গেছে; বুকের সরু সরু হাড়গুলো বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। বিছানায় শুয়ে ঔঁা—ঔঁা করে কাঁদে। গলা ভেঙ্গে স্বর বেশ ক্ষীণ হয়ে গেছে। ধুকতে ধুকতে কখন ঘুমিয়ে পড়ে।

এমনি করে চারটি প্রাণী তিল তিল করে মরণের পথে এগিয়ে চলেছে। শুধু একটি জনের অক্ষমতার বোঝা তারাও মাথায় করে বয়ে নিয়ে চলেছে। শুধু একটি জনের মরণ বাঁচনের উপর নির্ভর করছে তাদের তিনজনের মরণ বাঁচন। আজ প্রয়োজনের গভীর খাদের পাশে দাঁড়িয়ে সে প্রশ্ন করল,—কেন? কী ছিল না তার। তার স্বাস্থ্য ছিল, শক্তি ছিল—ছিল বুদ্ধি, সহ করবার অসীম ক্ষমতা। তার এই সমস্ত গুণগুলিকে মুছে ফেলে জড়িয়ে দিল আর একজনের ভাগ্যে। আজ তার চোখের সামনে ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে গেল। ধর্ম্মের কথা আদর্শের কথা গুলো আজ তার কাছে উপহাসের মত মনে হ'ল। সমাজ তাকে পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ দেয়নি, তাকে পঙ্গু করেছে, মূল্য দিয়েছে তার যৌবনটুকুকে। সেও ত এই দীর্ঘ আটটি বৎসর ধরে, স্বামীকে, পুত্র-কন্যাকে স্নেহ, মায়া, মমতা, তৃপ্তি দিয়ে গড়ে তুলেছে, শান্তি দিয়েছে। আজ তার বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুপথ-যাত্রী স্বামীর পাশে বুকভরা শুকনো প্রেম আর স্নেহ নিয়ে দাঁড়াতে হাসি পায়।

ঘন অন্ধকারে সমস্ত ঘরটা ডুবে গেছে। স্বামীর ঘরে প্রদীপটাও বোধ হয় নিভে গেছে। অন্ধকার রাত্রে পদ্মার দু'টি চোখের তারা চক্‌চক্‌ করে উঠল। শীর্ণ হাতের পেশীগুলো রেলিংএ স্থির দৃঢ় হয়ে এল! পেটের ক্ষুধা আজ অসহ হয়ে উঠেছে—মাঝে মাঝে মোচড় দিয়ে ওঠে। অসহ্য যন্ত্রণায় মাথার রগগুলো ফুলে ওঠে, ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে সমস্ত মাথাটা। স্বামীর ঘরে দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে দেখে এখনও প্রদীপটা টিম্‌টিম্ করে জলছে। স্বামী ততক্ষণ জেগে উঠেছে। পদ্মার সাড়া পেয়ে ক্ষীণ স্বরে বলল,—ওগো কিছু খেতে দাওনা, বড় খিদে পেয়েছে। পদ্মা ভেবে পায় না কী খেতে দেবে সে। তবু বলল, একটু দেরী কর, খাবার করে আনছি।

ততক্ষণে শুয়ে পড়েছে। মাথার কাছে আলা রয়েছে একটা কেরোসিন তেলের ডিবা, আলোর চেয়ে কালি দেয় বেশী। বদ্ধ বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে—ডিবার কালিতে আর পোড়া তেলের গন্ধে। ডাক শুনে কান্ত বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। বাইরে দরজা খুলে দেখল পদ্মা দাঁড়িয়ে। ডান হাতে ধরা ডিবার ক্ষীণ একটু আলো এসে পড়ল ওর মুখে, সারা গায়ে, কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে ফুলে ওঠা জায়গাগুলোয়। রহস্যময়ী আর সৌন্দর্য্যময়ী; শীর্ণ দীপ্ত শিখার মত।

কান্ত বলল,—কে, পদ্মা?

পদ্মা কোন কথা না বলে ওর কাছে এগিয়ে এসে সোজা বলে বসল,—গিরীনবাবুকে ডেকে আনতে পার?

কান্তর কাছে ব্যাপারটা এতক্ষণে জলের মত সরল হয়ে যায়। একটু হেসে বলে, তা যাব বইকি মা—তোমাদের জন্যই ত আমরা। তবু ভাল যে এতদিনে সুমতি হয়েছে।—ঘাড় ঘুরিয়ে আর একবার হেসে নেয়। পদ্মা নির্বিকার।

তা হলে তাড়াতাড়ি কর—বলে ঢুকে পড়ল পান-ওয়ালীর ঘরে। পানওয়ালী দ্রুত পা চালিয়ে অন্ধকারে মিশে গেল। সময়ের ঘোড়ার পা অকস্মাৎ যেন খোঁড়া হয়ে গেল। গতি মন্থর। দেওয়ালে টাঙ্গান জীর্ণ, আরশুলার ফাঁদ জড়ান, রংচটা ঘড়িটার কাঁটা ছুটো যেন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। আর সে বুঝি নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। বাইরে গেটের কাছে যেন একটা গাড়ী এসে থামল। গলায় দড়ি লাগিয়ে ঝুলে পড়বার পর মুহূর্তেই যেমন মানুষের সাধ যায় বেঁচে উঠবার, পদ্মারও তেমনি সমস্ত সত্তা আগ্রহে হয়ে ওকে টেনে নিয়ে যেতে চাইল ওর স্বামীর পাশে। পাগলের মত ছুটে এল বন্ধ দরজার সামনে। টান দিয়ে দেখে বাহির থেকে দরজা বন্ধ। কান্ত যাওয়ার বেলা কখন্ গোপনে শিকল তুলে দিয়ে গেছে। রূঢ় আঘাতে পদ্মা থমকে দাঁড়াল। ক্ষুধায় পেট মোচড় দিয়ে উঠল, অসহ্য যন্ত্রণায়। না—না, সে ফিরবে না, কিসের জন্য ফিরবে? মরতে? মরতে সে আসেনি। উপায় করবার সম্বল ঐ একটি মাত্র আছে, ভাটিয়ে যাওয়া যৌবনটুকু। আজ তাই সে বিক্রি করবে।

কান্ত আর গিরীন দরজা খুলে ভিতরে এল। দীর্ঘ সুকোমল চেহারা সুন্দরের উপর বোকার ছাপ। চোখের কোণে লোলুপ একটা চাউনি। ব্যগ্র, ভীত। পদ্মা নির্লজ্জের মত কান্তর সামনেই গিরীনের হাত ধরে বাইরে টেনে এনে বলল,—চল কোথায় নিয়ে যাবে।

সুবোধ শিশুর মত গিরীন, পদ্মার পেছনে পেছনে এগিয়ে চলল। গাড়ীতে এসে নিঃশব্দে দুজনে উঠে বসল।

—যতদূর ইচ্ছা নিয়ে চল, কিন্তু রাত্রি শেষের আগে ফিরিয়ে আনা চাই।—পদ্মা নিরাসক্ত চিত্তে বলে উঠল।

গাড়ী ততক্ষণে দ্রুত গলি পেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়েছে। গিরীন অন্ধকারে পদ্মাকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরতেই পদ্মা পাগলের মত বলে উঠল,—না, না; আমার টাকা চাই, হ্যাঁ, টাকা।—তার ঘোলাটে চোখের সামনে ভেসে উঠল তিনটি প্রাণীর মুখ, স্পষ্ট; হ্যাঁ, সে ত টাকার জন্যই এসেছে। গিরীন ওর লোলুপ, ব্যগ্র দুটি হাতের উপর একতাড়া নোট ফেলে দিল। উঃ এত! ওর চোখের তারা দুটো অন্ধকারে চকচক্ করে উঠল। বুকের কাপড় সরিয়ে ব্লাউজের মধ্যে সেগুলি গুঁজে দিল। অতিরিক্ত উত্তেজনায় পদ্মার মাথার মধ্যে কেমন জট পাকিয়ে গেল। ও মূর্চ্ছিত হয়ে পড়তেই, গিরীন ওর শিথিল, শীতল মাংস-পিণ্ডটাকে সজোরে বুকের মাঝে আঁকড়ে ধরল। উত্তেজনা নেই, বিস্বাদ, কনকনে শীতের রাত্রে ঠাণ্ডা খোলের মত। গিরীন চীৎকার করে ভয়ে বেষ্টন শ্লথ করে দিল। পদ্মা গড়িয়ে পড়ল ঘাড় গুঁজে গদি আঁটা সিটের উপর। গিরীন চীৎকার করে ড্রাইভারকে গাড়ী থামাতে বলল।

গিরীনের আদেশ পেয়ে ড্রাইভার ছুটে সামনের হোটেল থেকে জল এনে দিল একটা বড় পাত্রে করে। গিরীন পদ্মার মাথাটা ধীরে ধীরে কোলে তুলে চোখের উপর ঠাণ্ডা জলের ছাট দিতে লাগল। জল গড়িয়ে ওর দামী

গোল গোল। গাল দুটো চুপসে গিয়ে দুপাশে দুটো হাড় ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে। দুটি হাত ভরে কড়া পড়েছে, রগ্ ফুলে উঠেছে, তারই মাঝে মাঝে দুই একটা চুলি। এই আট, ন' বৎসরের মধ্যে কখন তার যৌবন এল উছল হয়ে আর কখন ভাটিয়ে গেল তার ঠিকানা সে খুঁজে পেল না। হৃত যৌবনের দিকে চেয়ে সে অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। হাতটা মুহূর্তের জন্য নড়ে উঠতেই আয়নাটা মেঝেতে পড়ে গিয়ে চুরমার হয়ে গেল। প্রদীপটাও ঐ সঙ্গে গেল নিভে। বড় ছেলেটা ঘুম ভেঙে অন্ধকার ঘরে চীৎকার করে উঠল। মা ছুটে এসে ঘুম পাড়ায়। ঘুম কি ধরে পেটের অসহ্য জ্বালাকে উপেক্ষা করে? চিমটে-পড়া পেটের উপর পা দুটিকে কুঁকড়ে এনে দুটি হাতদিয়ে জোরে চেপে ধরে। ক্ষুধার নাকি এতে একটু উপশম হয়! ছেলে জানে ঘরে খেতে দেওয়ার মত কিছু নেই। ঝিমিয়ে পড়ে। আঃ একটু ঘুমিয়ে পড়লে বাঁচে। একটু আগে উনুন জ্বেলেছিল, তাতেই ফুঁ দিয়ে কাঠি ধরিয়ে কোন রকমে প্রদীপ জ্বালে।

কুলুঙ্গীতে অনেক কালের এতটুকু একটা কাপড় কাচা সাবান খুঁজে বের করে সে তাই দিয়ে কলতলায় গা মাজতে বসল। চুলে চিটে পড়েছে, মাঝে মাঝে জট পাকিয়ে গেছে। কতদিন চুলে চিরুনী পড়েনি, মাখেনি একটু তেল। বেশ যত্নকরে চুল চিরে চিরে সাবান মাখল অনেকক্ষণ ধরে। শেষে স্নান শেষ করে উঠে পড়ল। রোগা শরীরে অনেকক্ষণ জল ঘাঁটার জন্য কাঁপুনি ধরিয়ে দিল। ট্রাঙ্ক খুলে ছেঁড়া কাপড় জামা সরিয়ে সরিয়ে খুঁজে বেড়াতে লাগল যদি একখানা ভাল শাড়ী বেরিয়ে পড়ে। বিয়ের দিন তার বাবা তাকে একখানা রঙীন শাড়ী কিনে দেয়। সেটাকে ত সে কোনদিন পরে নি। আদর করে গুছিয়ে রেখে দিয়েছিল। বিয়ের ঐ একটি মাত্র স্মৃতি। শেষে সেইটিই সে টেনে বের করে। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে একটা উড়ুনি, সবুজ রঙে সোনালি পাড় দেওয়া। এটা তার বাবা তার স্বামীকে কিনে দিয়েছিল। শাড়ীটাকে দু' হাতে ধরে চোখের সামনে মেলে ধরে একবার চোখ চারিয়ে নিল—মাঝে মাঝে আরসুলায় কুরে কুরে খেয়ে গেছে। পাট পাট খুলে কোমরে জড়িয়ে নেয়, বুকের পরে তুলে ধরে। পুরাণ কাপড়ের পাট থেকে বেরোয় কেমন একটা গন্ধ। পদ্মার বেশ ভাল লাগে। ওর রক্তে কেমন একটা সাড়া জাগল। নিজেকে একবার দেখবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু আয়না যে একটাও নেই। চুলে চিরুনী দিতে বসল। কতকালের ছাৎলা-পড়া সুগন্ধি তেল একটু ঢেলে নিল। পা'টা ফেটে ফেটে গেছে। জলপেয়ে কুঁকড়ে গিয়ে কোথাও কোথাও চামড়া উঠে পড়েছে। সে তারই উপরে আলতা বুলিয়ে নিল। পা'টাকে তুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল। বাঃ ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে! দাঁড়িয়ে কাপড়টাকে আর একবার টেনে-টুনে গুছিয়ে নিল। ছোট ছেলেটা বেশ ঘুমোচ্ছে। ফুঁ দিয়ে প্রদীপটা নিভিয়ে দিল। তাল তাল অন্ধকার হুড়মুড় করে করে একেবারে ওর গায়ের উপর এসে পড়ে ওকে ঢেকে ফেলল। না, আর দেরী করবে না। চৌকাঠ পেরিয়ে ধীরে ধীরে পা বাড়াল। দরজার একটা পাট বাতাসে কখন্ বন্ধ হয়ে গেছল লক্ষ্য করে নি, ডান হাতটা সজোরে তাতে ঠেকে গেল। হাতের একটি মাত্র শাঁখা সেই সঙ্গে গেল চুরমার হয়ে ভেঙ্গে। হাতটায় একটু যন্ত্রণা হচ্ছে, হয়ত কেটে গিয়ে দু'এক ফোঁটা রক্ত পড়ে গিয়ে থাকবে। যাক্, পদ্মার আজ ফিরে তাকাবার সময় নেই। দেওয়ালের ছোট একটা ইট-খসা গর্ত্ত থেকে একটা কাল পেঁচা ডেকে উঠল। আকাশের তারাগুলো ভিড় করে রুদ্ধ নিশ্বাসে চেয়ে আছে। অন্ধকার জমাট বেঁধে উঠেছে সামনে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে। কোথায় চলেছে সে? অন্ধকারে পথ বিপথ সব একাকার হয়ে গেছে। আজ তার কাছে সব পথ সমান। তবু সে হাঁপিয়ে উঠল। মনে হ'ল যেন বিশ্বের সমস্ত অন্ধকার নাক-মুখের ভিতর দিয়ে ঢুকে ওর বুকের মধ্যে কেমন করে চেপে বসেছে। বাতাস ক্রমশ যেন ভারী, তরল হয়ে উঠল গলান সীসার মত। কে যেন ওর গলা চেপে ধরেছে। চীৎকার করে উঠল,—ক্ষান্ত পিসী! ক্ষান্ত

পদ্মার শীর্ণ আঙুলগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে বলল,—পদ্মা, চল আমরা দূরদেশে গিয়ে কয়েক মাস বেড়িয়ে আসি। তোমার শরীরটাও সারবে, আমারও দেশ দেখা হবে।—পদ্মা কোন উত্তর দিল না। পদ্মার হাতে কোন শাঁখা না দেখতে পেয়ে অপরেশ বলল,—একি, তোমার হাতে একটাও শাঁখা নেই!

পদ্মার এতদিন খেয়াল ছিল না। অন্যদিকে পাশ ফিরে বলল,—কাল তুমি মাপ নিয়ে গিয়ে একজোড়া শাঁখা কিনে এনো।—পদ্মার দু'চোখে দু' ফোঁটা জল চক্‌চক্ করে উঠল। অপরেশ আর একদিকে মুখ ফিরিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করে।

কিন্তু ওরা কেউ জানল না অপরেশ নূতন চাকুরী পেয়েছে গিরীনের ফার্মে এবং গিরীনেরই প্রচেষ্টায়।—

আগুন

সুহাস কুমার রায়—দ্বিতীয় বর্ষ, বাণিজ্য

ঝড় উঠিয়াছে। প্রচণ্ড কালবৈশাখী নির্ম্মমভাবে সমস্ত প্রকৃতিকে লণ্ডভণ্ড করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। বিরাট ক্ষুধা তাহার জঠরে। সৃষ্টিকে সে তাহার ক্ষুধার অনলে আহুতি দিতে চায়।

ঝড় থামিয়াছে; কিন্তু তাহার নির্ম্মমতার চিহ্ন প্রকৃতির বুকে গভীর ভাবে আঁকিয়া দিয়াছে।

আমার জীবনেও ঝড় উঠিয়াছিল। কিন্তু আজও সে শান্ত হয় নাই, অশ্রান্ত গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে—গতি তাহার বাধাহীন। অসীমের বুকে গিয়া সে মিশিতে চায়। কিন্তু অসীমকে আজও সে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে নাই।

নিস্তব্ধ প্রান্তরের বুকে দাউ দাউ করিয়া চিতা জ্বলিতেছে। লেলিহান শিখা বাহির করিয়া সে বিপ্লবী সূর্য্যদার দেহটাকে গোগ্রাসে গিলিতেছে, সূর্য্যদার মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া ভিতরের ঘি গলিয়া গলিয়া পড়িতেছে। আর আমি এক বিরাট অভিশাপের ন্যায় চিতাটির পানে একদৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছি।

• • •

লোকালয় হইতে বহুদূরে নির্জ্জন পদ্মার কূলে আমাদের এই বাগানবাড়ী। রাত্রি হইয়াছে। বাহিরে পদ্মা উদ্দাম গতিতে আমাদের জীবনের সহিত সুর মিলাইয়া বহিয়া চলিয়াছে, আমাদের জীবনের গতি ওর প্রতি পদবিক্ষেপে ধ্বনিত হইতেছে। ভাঙ্গাচোরা অব্যবহৃত ঘরের মধ্যে একটা হারিকেন মৃদু মৃদু আলো বিকিরণ করিতেছে। আমি ও সূর্য্যদা একটা টেবিলের ধারে মুখোমুখি বসিয়া আছি। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সূর্য্যদা বলিলেন, "অনেকক্ষণ হয়ে গেল, এখনও মোহনসিং ফিরলনা। একটা বিপদ আপদ ঘটিয়ে বসল না ত? পদ্মার ওপারে যথেষ্ট কাজ পড়ে রয়েছে। রাতারাতি পদ্মা পাড়ি দিতে না পারলে সব ভেস্তে যাবে। কি মুস্কিল দেখ ত?" একটু অধৈর্য্য ও উৎকণ্ঠা তাঁহার কথার সুরে প্রকাশ পাইল।

প্রত্যুত্তরে আমি বলিলাম, "না, সে রকম কিছু হয়েছে বলে ত মনে হয় না। এখনও যথেষ্ট সময় আছে। আর পুলিশ ত কাল বিকেলের আগে আমাদের ওপারের ঘাঁটিতে সার্চ্চ করতে যাচ্ছে না। এর মধ্যে মালগুলো সরাবার আমরা যথেষ্ট সময় পাব।"

"সূর্য্যদা"

"কিরে, কিছু বলবি নাকি আমাকে"

"ততক্ষণ আপনার বিপ্লবী জীবনের ইতিহাস কিছু বলুন। আমি কবি, মনের পর্দ্দায় আমি তাদের গেঁথে রাখব। আর যদি সময় পাইত অনাগত বিপ্লবীদের জন্যে আমাদের ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ এগুলোকে লিপিবদ্ধ করে রেখে যাব।"

পিঠে একটা চাপড় মারিয়া স্নেহের সুরে সূর্য্যদা বলিলেন, "তুই একটা আস্ত পাগল। আমি কোন্ ছার! কত বড় বড় মহারথী নীরবে জীবন বিসর্জ্জন দিয়েছেন। কে তাঁদের খোঁজ রাখে? নেহাৎই যখন ছাড়বিনা, তবে শোন আমার স্মৃতিসাগর মন্থন করা প্রথম জীবনের ইতিহাস।—

প্যাণ্টুলনটা ভিজে সপ্‌সপে হয়ে গেল, খেয়াল নেই। পদ্মা ধীরে ধীরে চোখ মেলে চাইল; ঘোলাটে বিবর্ণ। সার্টের তলার কাপড় দিয়ে ওর চোখের কোণের ছাট-দেওয়া জল মুছিয়ে দিল। পদ্মা চেয়ে রইল স্থির দৃষ্টি মেলে, নিস্পন্দ। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল কয়েক ফোঁটা চোখের জল। ধীরে ধীরে বলল,—কিছু খেতে দাওনা, আজ দুটি দিন কিছু খাইনি।—গিরীনের বুকের উপর কে যেন একটা হাতুড়ির ঘা বসিয়ে দিল। ড্রাইভার প্রভুর ইঙ্গিতে একবাটি গরম দুধ এনে হাজির করল। গিরীন তাই একটু একটু করে পদ্মার মুখে ঢেলে দিল। তারপর গাড়ী আবার নড়ে উঠল। এখনও ঘোর কাটেনি, গিরীনের কোলের উপর মাথা রেখে পদ্মা পড়ে থাকে নির্জীবের মত। রাস্তার ধারে ধারে লাইটপোষ্টগুলি চকিতে ওদের তিনজনের মুখের উপর আলো ফেলে যায়।

গাড়ী সামনের একটা মোড়ে মুখ ফেরাল। গিরীন বলল,—পদ্মা, তুমি নিজে বুঝতে পারছ না, আজ তুমি কত বিকৃত আর অস্বাভাবিক হয়ে গেছ।—পদ্মা বুকের উপর দুটি হাত রাখতেই ভিতরের একতাড়া নোট খস্‌ খস্‌ করে উঠল। একটু উত্তেজিত এবং ভীত স্বরে বলল,—কিন্তু টাকা আমি দিতে পারব না।—চোখে ওর অসহায়ের দৃষ্টি। গিরীন অন্ধকারে মুখ ঢাকল, বলল,—দিতে হবে না।

পদ্মা একেবারে ঝুঁকে পড়ল ওর মুখের কাছে, দুচোখে দুটি বিস্ময়ের ক্ষীণ বাতি জ্বালিয়ে বলল—তার পরিবর্তে তুমি কী পেলে?

গিরীনের ঠোঁটের কোণে বাঁকা একটু হাসি। আলো থাকলে পদ্মা দেখতে পেত শয়তানের চোখেও জল নামে। বলল, ভগবান জানেন।

পরদিন বেশ বেলায় ঘুম ভাঙ্গল পদ্মার। চোখ মেলে দেখে পানওয়ালীর ছেঁড়া কাঁথা পাতা একটা অপরিষ্কার বিছানায় শুয়ে আছে। তাড়াতাড়ি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল। রাত্রের ঘটনা বিস্মৃতির আড়াল থেকে এক আধটা অসম্পূর্ণ ছবির মত মুহূর্তে ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে যায়। একটা দুঃস্বপ্নের মত। ঘরের কোণে তিনটি প্রাণীর কথা মনে পড়ে। উন্মাদের মত ছুটে বেরিয়ে এল। পাড়ার দু'চার জন মেয়ে রাত্রের এঁটো বাসন নিয়ে অত ভোরে কলতলায় চলেছে। ওকে দেখে তারা হেসে উঠল, চাপা কুৎসিত হাসি। পদ্মার ফিরে তাকাবার সময় নেই। ঘরে এসে দেখে উঠানের উপর তেমনি শুয়ে বড় ছেলেটা। ঘরের মধ্যে ছোট ছেলেটাও তেমনি ঘুমিয়ে, নিস্পন্দ। ডাকে, খোকন—খোকন! শীতল, স্থির এক খণ্ড মাংস। পদ্মা চীৎকার করে তাকে বুকের মাঝে জড়িয়ে মেঝেতে লুটে কেঁদে ওঠে। না—না তার কাঁদবার সময় নেই। তার স্বামীর এবং অন্য ছেলেটির অবস্থা হয়ত শেষ মুহূর্তে এসে পৌঁছেচে। এখুনি তাদের ওষুধ পথ্য না দিলে হয়ত তাদের ফিরে পাওয়া যাবে না। নিশ্চয়ই তাদের খেতে দেবে, ডাক্তার দেখাবে, ওষুধ এনে দেবে। একটি মৃত শিশুর দুঃখ সে ভুলে যায়, আশার আনন্দে চোখ দুটো চিক্‌চিক্‌ করে উঠল। বুকের মধ্যে হাত চালিয়ে দিল, এক টুকরাও কাগজ নেই। বাম হাতটা শিথিল হয়ে পড়ে, টেনে নেবারও অবসর হয় না। ওর চোখের সামনে বাড়ীর সমস্ত দেওয়ালগুলো যেন অকস্মাৎ ভেঙ্গে পড়ল গায়ের ওপর। পদ্মা নিজেকে সামলে রাখতে পারল না। কে যেন চুলের মুঠি ধরে জোর করে মাটিতে শুইয়ে দিল।

সে দিন সকাল থেকে পানওয়ালীকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ঘটনার কয়েক মাস পরে।

পদ্মার স্বামী ভাল হয়ে উঠেছে। এখন প্রত্যেক দিন অফিসে যাতায়াত সুরু করেছে। একটা নূতন চাকুরীতে পদোন্নতি হওয়ায় প্রায় একশত টাকা বেতন বেড়ে গিয়েছে। আগের চেয়ে অবস্থা বেশ সচ্ছল হয়েছে।

পদ্মার মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন এসেছে। পদ্মা দিনে দিনে কেমন রোগা হয়ে পড়ছে। কতদিন তাকে হাসতে দেখা যায় নি।

সেদিন একটা খাটে পদ্মা আর তার স্বামী শুয়ে। পাশে ছোট খাটটীতে ঘুমিয়ে বড় ছেলেটা। অপরেশ

কিনা। আমি সেই রাত্রেই ঝড় জলের মধ্যে চা বাগান পরিত্যাগ করলাম।

"তারপর দীর্ঘ ছ'বছর পরে তেমনি এক ঝড় জল ভরা রাতে চা বাগানে ফিরে এলাম। সোজা সাহেবের বাংলো বাড়ীতে এসে ঢুকলাম। সাহেব তখন বসে ডেস্কের ওপর একটা কাগজ রেখে মনোযোগ সহকারে কি লিখছিল। পাশ দিয়ে ঘুরে সামনে গিয়ে রিভলবারটা তার বুক লক্ষ্য করে ধরে চিবিয়ে চিবিয়ে বললাম—সাহেব আমাকে চিনতে পার?

হঠাৎ গলার স্বর শুনতে পেয়ে চমকে উঠে সাহেব মুখ তুলল। আমাকে চিনতে পেরে তার সারা দেহটা ভয়ে ফ্যাকাসে মেরে গেল। ড্রয়ার থেকে রিভলবারটা টেনে বার করতে গেল—কিন্তু উৎকণ্ঠায় পারল না। হাতটা থর থর করে কেঁপে চেয়ারের পাশে পড়ে গেল।

শান্তস্বরে বললাম—সাহেব, ভয় নেই। তোমার মত কাপুরুষকে আমি প্রাণে মারব না, কিন্তু উচিত শিক্ষা দিয়ে যাব।

বাঁহাতে রিভলবারটা ধরে এগিয়ে এসে তার হাত দুটোতে পর পর দুটো ইন্‌জেকশান করলাম। হেসে বললাম, এ হাত দুটো তোমার পাশব প্রবৃত্তির চরিতার্থ করতে অনেক প্রেরণা জুগিয়েছে। তাই ও-দুটোকে চিরকালের জন্যে অকেজো করে দিলাম। আর তোমার দেহটা ধীরে ধীরে Paralysed হয়ে যাবে। অপরাধের তুলনায় এমন কিছু বেশী শাস্তি নয়। আচ্ছা Good-bye।

সাহেবকে সেই অবস্থায় রেখে দরজাটা ধীরে ধীরে ভেজিয়ে তেমনি ভাবেই ফিরে গেলাম।" সূর্য্যদা থামিলেন। উদাস দৃষ্টিটাকে বাহিরে নিস্তব্ধ প্রান্তরের বুকে ধীরে ধীরে প্রেরণ করিলেন। এমন সময় মাথা নত করিয়া শ্লথ গতিতে মোহন সিং ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার চেহারা দেখিয়া আমি চমকাইয়া উঠিলাম—তাহার সারা মুখে কে যেন গাঢ় কালির প্রলেপ মাখাইয়া দিয়াছে।

একটা নিরুদ্ধ গ্লানিতে মোহনসিং ভাঙ্গিয়া পড়িল, ভগ্নকণ্ঠে উত্তেজনায় চীৎকার করিয়া উঠিল, "সূর্য্যদা আমাকে মেরে ফেলুন, আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, কতকগুলো টাকার লোভে আমি পুলিশকে আমাদের এই গুপ্ত আস্তানার কথা বলে দিয়েছি।"

ঘরের মধ্যে যেন বজ্রাঘাত হইল। আমাদের কত বৈপ্লবিক কার্য্যের সহায়ক এই মোহনসিং—সে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে ইহাও কি সম্ভব!

মোহন সিং বলিয়া চলিল; "দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে আমি নিজেকে ঠিক রাখতে পারিনি সূর্য্যদা। কতকগুলো টাকার বিনিময়ে আমার কত বিনিদ্র রজনীর সাধনা, স্বপ্ন সব কিছুকে বিক্রি করে দিয়ে এসেছি, কিন্তু সত্যিই কি আমার স্বপ্নকে আমি ব্যর্থ করতে পেরেছি? এক সূর্য্যদাকে হয়ত আমার বিশ্বাসঘাতকতার ফলে পুলিশের হাতে পরাজয় বরণ করতে হবে; কিন্তু অত্যাচারের মধ্যে থেকে, শৃঙ্খলাবদ্ধা ভারত জননীর ক্রন্দনের মধ্যে থেকে যুগে যুগে যে সব সূর্য্যদারা জন্ম নিচ্ছেন তাদের দাবিয়ে রাখবার মত শক্তি পুলিশের নেই। নদীর ধারটা পুলিশে এখনও ঘেরে নি, চেষ্টা করলে পালাতে এখনও হয়ত পারা যাবে। শীগগির আমার পেছু পেছু চলে আসুন সূর্য্যদা, দেরী করবেন না। শেষবারের মত আমাকে বিশ্বাস করুন।"—শেষের দিকটা গভীর উদ্বেগে মোহন সিংএর কণ্ঠস্বর ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

তিনজনেই বাগানে আসিয়া দাঁড়াইলাম। গাঢ় অন্ধকার সমস্ত বাগানটার বুকের উপর সমাচ্ছন্ন। ধীরে ধীরে গাছের আড়ালে আড়ালে আত্মগোপন করিয়া প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হইলাম। প্রাচীরের ওপারেই বিচিত্র গঙ্গা কূলে কূলে প্রবাহিত। মনে হইল এই অন্ধকারের মধ্যে মৃত্যু সঙ্গোপনে আত্মগোপন করিয়া আছে—প্রস্তুত হইবার অবসর না দিয়াই হয়ত নিঃসাড়ে গ্রাস করিবে। কতকক্ষণ চলিবার পর প্রাচীরটার নীচে আসিয়া পৌছিলাম; মোহন সিং কথা বলিল, কণ্ঠে তাহার পরিপূর্ণ তৃপ্তি, "যাক এতক্ষণে আমরা নিরাপদ। আজ এইটুকু সান্ত্বনা আমার রইল যে দৈত্যের কাছে আমি পরাজয় বরণ করেছিলাম কিন্তু দৈত্য আমাকে জয় করতে পারেনি।

"আসামের সুদূর চা বাগানে আমার জন্ম হয়। সে এক অদ্ভুত জগৎ। সভ্যতার আলোক আমাদের গভীর বন জঙ্গল ভেদ করে সেখানে প্রবেশ করে নি। প্রতিবেশী বলতে অশিক্ষিত বর্বর একপাল কুলী। বাবা ছিলেন বাগানের ডাক্তার। বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্রমে ক্রমে বড় হয়ে উঠলাম। উপলব্ধি করলাম কুলীদের অসহায় অবস্থা, প্রত্যক্ষ করলাম তাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার। তাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের শেষ অংশটুকুও মরে নিষ্পেষিত হয়ে গেছে। মাথা পেতে সহ্য করে বাগানের সাহেবের নির্মম অত্যাচার। কতবার লক্ষ্য করেছি সাহেবের চাবুকে তাদের পিঠ ফেটে দরদর করে রক্ত পড়ছে। কিন্তু এতটুকুও প্রতিবাদ জানায় নি। মার খেয়েও চিরাগত প্রথা অনুযায়ী তারা সেলাম জানিয়ে আনুগত্য প্রকাশ করেছে। গভীর রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেছে, দেখেছি তারা হল্লা করে মদ খাচ্ছে। মদ দিয়ে তারা হৃদয়ের গভীর ব্যথাকে ঢাকতে চায়। মনটা বিষিয়ে ওঠে, কেমন একটা অসহ্য উত্তাপ শরীরের মধ্যে অনুভব করি। কিন্তু ক্ষণেকের জন্যে। তারপর সে উত্তাপ জল হয়ে যায়। আমি যে নিরুপায়। কতবার দেখেছি সাহেবের চাপরাশীরা সাহেবের পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার সাহায্য করতে ওদের ঘরের মেয়েদের টেনে নিয়ে গেছে। ওরা প্রতিবাদ জানায়নি। মদ খেয়ে, মাদল বাজিয়ে নিজেদের দুঃখকে ভুলতে চেয়েছে। ঈশ্বরের অভিশাপের মত ওরা মাথা পেতে তা গ্রহণ করেছে।"

স্বর্ণদা একটু থামিলেন। একটা ব্যথার ছায়া তাঁহার মুখের উপর নিবিড় হইয়া উঠিল।

"তারপর আমার জীবনে এল সেই স্মরণীয় রাত্রি। বেশ রাত হয়েছে, বাইরে অশ্রান্ত ধারে বৃষ্টি পড়ছে। আমি আর বাবা ঘরের মধ্যে বসে গল্প করছি। হঠাৎ একটা আর্ত চীৎকার শুনে আমরা দুজনে দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম সেই ঝড়-জল ভেদ করে ভজুয়া আমাদের বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বাবাকে দেখে একবার সে বুকফাটা চীৎকার করে উঠল, —বাবু, আমার বহুয়াকে সাহেব মেরে ফেলেছে। কথাটা সে শেষও করতে পারল না, একটা অসহ্য বেদনায় ছিন্ন তরুর মত বাবার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল। শতাব্দীর ঘুম তার ভেঙ্গেছে, আজ সে প্রতিবাদ জানাতে বাবার কাছে ছুটে এসেছে। বাবা তাকে ঘরে টেনে এনে বললেন—কি হয়েছে তোর খুলে বল। সে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল, বলল—বাবু, আজ সকাল থেকে বহুয়ার প্রসব ব্যথাটা বড় বেড়েছিল, তাই সে চা বাগানে কাজ করতে যেতে নারাজ ছিল। সেজন্য সাহেব নিজে এসে তার তলপেটে লাথি মারে। সেইখানেই একটা মরাছেলে প্রসব করে বহুয়া মারা যায়। তার কথা শেষ হল না, সাহেবের ঘোড়া এসে দরজার সামনে থামল। হাতে তার লিকলিকে চাবুক। ভজুয়াকে আমাদের এখানে দেখে তার ওপর সপাসপ চাবুক চালাল। ভজুয়া ঘুরে মাটিতে পড়ে গেল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সাহেব বাবার কাছে এগিয়ে এসে বলল,—ডাক্তার, লিখে দাও ঐ বউটা প্রসব করতে গিয়ে মারা পড়েছে।—নিজের মনের আনন্দে সে হা হা করে হেসে উঠল। অদ্ভুত শান্তস্বরে বাবা বললেন,—তুমি কি ভাব আমার বিবেক বলে কোন পদার্থ নেই? তুমি এই যে দিনের পর দিন অসহায় কুলীদের ওপর অত্যাচার করে চলেছ এর কি কোন প্রতিকার নেই? আজ আমি তোমাকে জানিয়ে দিলাম এই অসহায়, মারখাওয়া জাতটার বুকে আগুন জ্বেলে দিতে আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব। সাহেবের চোখ দুটো জ্বলে উঠল। একটা কথাও না বলে বাবাকে সে উপর্যুপরি দুবার গুলি করল। বাবা সেইখানেই অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। সাহেব আমার দিকে একবার অবহেলার দৃষ্টিতে চেয়ে চাবুকটা মুখের সামনে দু'বার ঘুরিয়ে উদ্ধত বিজয়ী বীরের মত ঘোড়ায় চেপে চলে গেল। আমার বয়স তখন বার বছর। চোখ দিয়ে এক ফোঁটাও জল পড়ল না। বাবার দেহ ছুঁয়ে শুধু প্রতিজ্ঞা করলাম এর প্রতিশোধ আমি নেবো। বাবার মৃতদেহ সেইখানেই পড়ে রইল, জানিনা তা সৎকার হয়েছিল

কবিতা

'হে বরেণ্য বিদ্যাব্রতী'—

অধ্যাপক অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

তোমার গৌরবে, গুণি, গৌরবিত মনীষি-সমাজ,
গৌরবিত মনীষার আশা ; সাগ্রহে তোমারে আজ
শ্রদ্ধাভিনন্দন দানি' রচিলাম স্বস্তি-অভ্যর্থনা।

বিশ্ব-জিজ্ঞাসার যজ্ঞে যে-ঋত্বিক করে উপাসনা
বিদ্যাশ্রমে পরমা প্রজ্ঞার, যে বিদ্যার্থী মুক্তি লাগি'
তমসার মোহ ভেদি' জাগে নিত্য জ্যোতি-অনুরাগী,—
মৃত্যুর বন্ধন ছেদি' অমৃতে যে করে অভিযান,
গাহে উদ্বেজিত রঙ্গে সূর্যের সুন্দর জয়-গান—
তুমি তার সতীর্থ সুহৃৎ।

তোমারে বরণ করি
শ্রদ্ধাভরে স্মরি—যারা শত সাধনায় অবতরি'
লভিতেছে সম্পূর্ণ জীবন, রাখিছে অমর নাম,
ডাকিছে অক্লান্ত সুরে অসংখ্য আত্মারে অবিশ্রাম
অবিদ্যার কাম্য মোহ হতে।

হে বিজ্ঞানী, জানো তুমি
কালের পাপের মঞ্চে আমার বরেণ্যা মাতৃভূমি
অবিদ্যার নিয়েছে আশ্রয় ; অন্নময় ক্ষুব্ধমনা
আনন্দের ভুলেছে সাধনা ; বাসনার বিড়ম্বনা
দিশি দিশি বিকীরিছে লালসার লেলিহান শিখা,
বিদ্যা আজ গেছে মরি', আছে ভরি' বিদ্যা-অহমিকা।

যে বিদ্যা যথার্থ সত্য, বিদ্যার্থীর নহে ছদ্মবেশ,
আনন্দের মুক্তি-মন্ত্রে যে-বিদ্যা আহ্বানে পরমেশ,
যে-বিদ্যা বিশ্বের বক্ষে প্রকাশে পবিত্র প্রশান্তিরে,
সুন্দরের শান্ত ছন্দে নন্দিত করিয়া অবনীরে
যে-বিদ্যা বিস্তারে নিত্য অপূর্বের অনন্ত অভয়,
সে-বিদ্যারে দাও ডাক ; আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়
শিব হক অন্তরে বাহিরে। হে বরেণ্য বিদ্যাব্রতী,
দেখুক নিখিল-বিশ্ব ভারতের প্রতিভা মহতী
ভারতের আদর্শ নিলয়।

আমার ভারতে জানি
একদা নিখিল বিশ্ব অবতরি' শান্ত যুক্তপাণি
মাগিবে প্রজ্ঞার আশীর্বাদ ; জানি জানি সত্য হবে
কবির গভীর আশা : অবারিত আনন্দ উৎসবে
প্রফুল্লিবে বিদ্যার বাসনা ; এ-বিশ্বের বিদ্যালয়
সিদ্ধালয় হবে সাধনায় ; সেদিন সুদূর নয়
কালের অব্যর্থ বাণী আসে।

হে বরেণ্য বিদ্যাব্রতী,
শুভক্ষণে শুভলগ্নে বসিয়াছ করিতে আরতি
বিশ্ব-বিদ্যালয়-দেবতারে। জানি জানি হবে জয়,—
তোমার সাধন-গুণে জয়ী হবে বিশ্ববিদ্যালয়,
কহিবে নির্দ্বন্দ্ব ছন্দে ভবিষ্যের সন্তান-সন্ততি :
অমরের বরযাত্রী তুমি। যে-সুন্দরী শুভমতি
বিজয়-মালিকা করে অমরের গাহে অভ্যর্থনা,
যাহারে মর্যাদা দিতে সহস্র সাধক পুণ্যমনা
অমরের সাথে চলে, অমরে-অমর হয়ে চলে,—
যুগ হতে যুগান্তরে যাদের সোনার নাম জ্বলে
সোনার সূর্যের মতো, তাদের সভায় যেন তুমি
উজ্জ্বল হইয়া জাগো শত কীর্তি জীবনে কুসুমি'।

তোমার গৌরবে, গুণি, গৌরবিত মনীষি-সমাজ
গৌরবিত মনীষার আশা ; সানন্দে তোমারে আজ
শ্রদ্ধাভিনন্দন দানি' রচিলাম স্বস্তি-অভ্যর্থনা,
জানালাম কৃতাঞ্জলি : জয়ী হক আদর্শ সাধনা।*

---

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্মানার্থে আশুতোষ কলেজ অধ্যাপক সঙ্ঘ অনুষ্ঠিত সম্বর্ধনা সভায় লেখক কর্তৃক পঠিত। সভাপতি—ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

আর একটা কথা মনে রাখবেন সূর্য্যদা—মানুষ মানুষই। মানুষ মাত্রেই পদস্খলন হয়। বিদায় সূর্য্যদা।" মোহন সিং নিজেকে নিজেই গুলি করিল।

"সূর্য্যদা চলুন, দেরী করলে সব মাটী হয়ে যাবে।" আমার কথা যেন সূর্য্যদার কানে প্রবেশ করিল না। মোহন সিংএর মৃতদেহটার পানে নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া তিনি কহিলেন, "অদ্ভুত এই মোহন সিং! দু মুঠো অন্ন, তাও এদের বরাতে জোটে না। কিন্তু এরা নেমকহারাম নয়, প্রাণ দিয়ে এরা দেশকে ভালবেসেছে।" ব্যথায় তাঁহার গলার স্বর ভারী হইয়া উঠিল।

অস্পষ্ট একটা মর্ম্মরধ্বনি ভাসিয়া আসিল। একটা টর্চ্চের আলোক আমাদের দুজনার উপর ঝিলিক মারিয়া চলিয়া গেল। দুজনাই গভীর উৎকণ্ঠায় কোনক্রমে প্রাচীরে উঠিলাম; কিন্তু শেষ রক্ষা হইল না। অকস্মাৎ একটা গুলি আসিয়া সূর্য্যদার কাঁধে বিদ্ধ হইল। গুলিবিদ্ধ অবস্থাতেই সূর্য্যদা আর আমি প্রাচীরের ওপারে লাফাইয়া পড়িলাম। নত হইয়া সূর্য্যদার দেহটাকে পিঠে তুলিয়া লইলাম। তাঁহার কাঁধের উষ্ণরক্তে আমার ঘাড় সিক্ত হইয়া উঠিল। আমার এই আকুল প্রচেষ্টা দেখিয়া সূর্য্যদা ম্লান হাসিলেন; কহিলেন, "আমার এই ভাঙ্গা দেহটাকে কোথায় বয়ে নিয়ে যাবি যতীন! তার চেয়ে আমাকে এখানে ফেলে রেখে তুই পদ্মা পাড়ি দে, চেষ্টা করলে এখনও বাঁচতে পারিস।"

আমি শুধু আর্ত্তকণ্ঠে বলিলাম—"সূর্য্যদা!" সূর্য্যদা হাসিলেন।

কতক্ষণ পরে বা কত পরিশ্রমে পদ্মার বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালার সহিত যুদ্ধ করিয়া আমাদের ক্ষুদ্র ডিঙ্গি নৌকাটীকে আশ্রয় করিয়া ওকূল হইতে একূলে আসিয়া পৌঁছিলাম তাহা জানিনা; শুধু জানিতাম যে মরণোন্মুখ সূর্য্যদা আমার সঙ্গে আছেন এবং তাঁহার অসমর্থ দেহটাকে বহন করিবার ভার আমার উপরে অর্পণ করিয়াছেন। গভীর মমতায় তাঁহার অশক্ত দেহটাকে তীরে নামাইলাম। কিন্তু তাঁহার অবস্থা দেখিয়া একটা অব্যক্ত বেদনা সমস্ত হৃদয়টার মধ্যে গুমড়াইয়া গুমড়াইয়া উঠিতে লাগিল। আমার চোখে জল দেখিয়া সূর্য্যদা কহিলেন, "কাঁদছিস কেন? কাঁদিস না, তোর সূর্য্যদা ত চিরদিন বেঁচে থাকবে না। একদিন ত মরতেই হবে। আয়, শোন"—স্নেহভরে সূর্য্যদা আমাকে ডাকিলেন। ডান হাত দিয়া আমার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনি বলিলেন, "জানিস আজ কোন্ দিনটা মনে পড়ছে। সেই যে-দিন তুই প্রথম আমার কাছে এসে বলেছিলি—সূর্য্যদা আমাকে কাজ দাও; কটা গাড়ী বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে হবে বল। তোর সেদিনকার কচি ফুটফুটে চেহারা দেখে আমি হেসে উঠেছিলাম। আজ তোর সামনে আমি অফুরন্ত কাজ রেখে যাচ্ছি। তখন যেমন কাজ কাজ করেছিলি এখন কত কাজ করবি কর। হয়ত বা মৃত সূর্য্যদাকে উদ্দেশ করে বলবি—আমি আর পারছি না সূর্য্যদা, আমাকে অবসর দাও!" সূর্য্যদা পরম কৌতুকে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

পদ্মা অবিশ্রাম গতিতে পাড় ভাঙ্গিয়া চলিয়াছে। শব্দ হইতেছে ঝুপ, ঝুপ। সূর্য্যদা সেই দিকে চোখ ফিরাইলেন। একটা অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ তাঁহার মুখে চোখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। তিনি উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া উঠিলেন। "এর মত তুই সমস্ত বাধা বিপত্তি চূর্ণ ক'রে ছুটে যা। আগুন জেলে দে। প্রত্যেক হৃদয়ের কন্দরে কন্দরে আগুন জেলে দে। এ জাতটা পুড়ে ছাই হয়ে যাক। তুই শুধু একবার ওদের জেলে দে ভাই।"

আগুন জ্বলিয়াছে।—

গাঢ় অন্ধকারের মাঝে চিতা জ্বলিতেছে। চতুর্দ্দিকে আলোক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। সত্যিই কি মৃত্যু সূর্য্যদাকে জয় করিয়াছে? সাধ্য কি মৃত্যু সূর্য্যদাকে স্পর্শ করে। সূর্য্যদার দীপ্তিতে মৃত্যু পুড়িয়া ভস্ম হইতেছে। প্রখর ভাস্করের ন্যায় সূর্য্যদা আপনাতে আপনিই পুড়িতেছে।

নৌকা বেয়ে চল্

পূর্ণেন্দুকুমার মল্লিক—দ্বিতীয় বর্ষ, বাণিজ্য

নৌকা বেয়ে চল্ মাঝি তোর নৌকা বেয়ে চল্।
অধীর হলো উতল নদীর চপল জলের ছল,
মাঝি তুই নৌকা বেয়ে চল্।

চাঁদ উঠেছে আকাশ তলে—আধেক-বাঁকা চাঁদ,
নবীন প্রেমের আঁখির মতো—হৃদয়-ধরা ফাঁদ
স্বপন-পরীর তরীর মতো—স্বপ্ন-লোকের সাধ।
আহা রে—আধেক-বাঁকা চাঁদ।
নীল সায়রের কোন্ কূলে চাঁদ ভিড়্‌বে কোথায় বল্?
নৌকা বেয়ে চল্ মাঝি তোর নৌকা বেয়ে চল্॥

নীরব রাতি গহীন হলো—নিঝুম শাদা পথ,
সুদূর গাঁয়ের বুকের মাঝে মায়ায়-বাঁধা পথ,
দেশান্তরের পরশ-ভোলা গোলোক-ধাঁধাঁ পথ,—
ঐ পথে কোন্ শেষের আশায় ব্যাকুল বনস্থল।
নৌকা বেয়ে চল্ মাঝি তোর নৌকা বেয়ে চল্॥

ভাঙা হাটের পাশ কেটে চল্ বাঁধা-ঘাটের পাশ,
শ্মশান-চিতার আবছা-আলোয়—রাঙা বাটের পাশ,
ধূ-ধূ চরের বাঁক্ পেরিয়ে উদাস মাঠের পাশ,—
প্রতিধ্বনি বাজ্‌বে সেথায় করুণ ছলাৎ ছল।
নৌকা বেয়ে চল্ মাঝি তোর নৌকা বেয়ে চল্॥

ক্লান্ত পাখির শান্ত ডানায় চমক্ লাগে ঐ,
ঝরা-ফুলের গন্ধে পালের পুলক জাগে ঐ,
লক্ষ মাণিক জ্বলে হঠাৎ ঢেউয়ের দাগে ঐ,—
অধীর হলো উতল নদীর চপল জলের ছল।
নৌকা বেয়ে চল্ মাঝি তোর নৌকা বেয়ে চল্॥

ীহারিকার পুঞ্জে কোথায় ছায়াপথের শেষ?
াতের পরী অভিসারে চললো নিরুদ্দেশ,
শিশির-ভেজা নিচোল কাঁপে আকুল ভীরু বেশ—
জানা কোন্ তারার আলোয় দিগন্ত ঝল্‌মল্।
ীকা বেয়ে চল্ মাঝি তোর নৌকা বেয়ে চল্॥

বনের দেশে

নীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার—প্রাক্তন ছাত্র

ক্ষয়িষ্ণু মন পেলো সন্ধান প্রান্তরের—
নীল আলো আর সবুজ-লতায় জীবনটা
দোল্ খেলো খুব হাওয়ার সাথে দিগন্তের—
মৃত্যু দিয়ে তৈরী তো নয় এ মনটা।

ডাক্‌ছে ডাহুক্। কপোত ঘুমায় কোন্ বনে,
ধ্বংসাবশেষ 'নীলকুঠির'-ও ভোর এলো—
কোন্ পৃথিবীর কে কেঁদেছে কোন্ ক্ষণে
সে-সব ভুলে প্রাণটা কেবল গান গেলো।

একটি খোঁপার আন্‌মনা-ফুল পাই খুঁজে
সাঁৎসেতে ওই অন্ধকারের ঝাপ্‌টাতে—
আস্‌ছে রোদের সন্ধ্যাবেলায় চোখ বুজে
বুঝ্‌তে পেলাম করুণ কোমল তাপ্‌টাতে।

বনবিহগী আকাশটাকে চিন্‌বে কি?
আজকে আমার বনের দেশে মন উধাও—
শান্ত-শীতল রাত্রিকে সে কিন্‌বে কি?
বনফুলের হলদে-সবুজ গন্ধটাও?

ফল্গু

ফ. ভূ. মু.

সুরার মাঝে আঙুর যেমন রসটি গোপন রাখে,
স্বপন-লোকে মর্ম তোমার মূর্তিটিরে আঁকে।
দেবতা কাছে যখন সদা চাইতে থাকি বর,
হৃদয়-গুহার অন্তরে দাও তুমিই তো উত্তর।
কাতর মম চক্ষে জাগে অশ্রু শতদল—
দেবতা বোঝে, তা-ও যে প্রিয় প্রেমের প্রতিফল।

(E. B. Browning-এর 'Sonnets from the Portugeese'-এর একটির ভাবানুলম্বনে।)

রুদ্র-বরণ

সংযুক্তা কর—চতুর্থ বর্ষ, সাহিত্য

আজি হায়
মধু মাস যায়।
পশ্চিম দিগন্তে লাগে বিরহ পরশ,
মুঞ্জরি' ঢলিয়া পড়ে পত্রগুচ্ছ শ্যামল সরস।
ঝরা বকুলের গানে ভূমিতলে শিহরিত আন্দোলন জাগে।
বিচ্ছেদের মীরোচ্ছ্বাসে নদীবক্ষে উতরোল প্রাণস্পন্দ লাগে।
আকুল সমীর আজি শুষ্ক বেণুবনে যেন তোলেরে নিঃশ্বাস।
রক্তিম কিংশুক শাখে লাগে তার বেদন আভাস।
ক্ষীণতম হয়ে আসে বিহঙ্গের গীতি।
ম্লান হয় মালতীর স্মৃতি।
বসন্ত বিদায় মাগে,
আর্ত অনুরাগে॥

ওগো ভাই
শুনিছি সদাই
ছন্নছাড়া ছন্দ-হারা বাঁশী
অলক্ষ্যে বাজায় কোন্ বাউল সন্ন্যাসী।
মেঘহীন নভোপরে সূর্য্যদেব হাসে যেন ক্রূর পরিহাস।
ধরণীর রক্তে তাই উঠে নিনাদিয়া নিত্য কার উচ্চ অট্টহাস।
ঈশানের কোণে কভু মেঘমন্দ্রে বাজে বুঝি ঝঙ্কার মঞ্জীর।
ছিন্ন পুষ্পদল লয়ে ছুটে মত্ত অধীর সমীর
চঞ্চল-পরশ-লাগা অশোকের বনে।
বহ্নি জ্বলে বৈরাগী যৌবনে।
বাজে পাঞ্চজন্য শাঁখ।
আসে কার ডাক?

একি খেলা
বিদায়ের বেলা?
ওগো কোন্ আদি কবি আজো
নটরাজ নৃত্যতালে বিশ্বনাট্যে সাজো?
সাথে তব কোন্ ছন্দে কোন্ বাণী এনেছ বহিয়া?
শ্রান্তিহীন পাদক্ষেপে সমগ্র ধরিত্রী ব্যেপে গাহ গান রহিয়া রহিয়া।
চঞ্চল অঞ্চল তব ঘূর্ণাপাকে ওড়ে যেন জয়কেতু সম॥
ভয়ালের মাঝে জাগে ভরসার মূর্তি নিরুপম।
হে সুন্দর, হেরি কোন্ কল্যাণের ছায়া
অভিনব কোন্ কান্ত মায়া?
অপূর্ব স্বরূপ তব
নিত্য নব নব॥

কে বলে তুমি বাহিরে রহ, কে বলে তুমি দূরে

নীরেন্দ্রনাথ সেন—দ্বিতীয় বর্ষ, বিজ্ঞান

কে বলে তুমি বাহিরে রহ, কে বলে তুমি দূরে।
আমারি মাঝে অতি গোপন সুরে
তোমার গীতি ঝংকারিয়া যায়।
মনের মম গভীরতম অতি বিজন ঘরে
অনাদি কাল তরে
বাজে তোমার বীণা।
এ আমি সে পায় না দ্বারের চাবি,
বাহির পানে তোমায় করে দাবি,
"কোথায় তুমি, কোথায় তুমি হায়।"
গোপন হ'তে গোপনতর মাঝে
প্রাণে আমার যে গানখানি রাজে,
সেথায় আমি তোমায় খুঁজি না যে।
যে গান রহে নীরবতায় ভরা
তাহার মাঝে দাও যে তুমি ধরা।
অনন্তসুর জড়ায়ে এক হ'য়ে
সংগোপনে মিশেছে সেথায়;—
যেথায় আমি হারাই আপনারে
তোমার ধ্বনি সে পথ বাহি যায়।

বাণী। হ্যাঁ, নাটক—এক অত্যাচারিত অবহেলিত মহা-জাতির কাহিনী। এতে থাকবে তাদের কথা—

[ওর কথার মাঝখানেই সমরবন্ধু এসে ঢুকল]

এ-নাটকে আমি লিখব তাদের কথা—বিদেশী প্রভুর নির্মমতায় অতিষ্ঠ হয়ে যারা মনে-প্রাণে চেয়েছিল মুক্তি—শুধু নিজের নয়, সমগ্র জাতির মুক্তি, সমগ্র বিশ্বের স্বাধীনতা—

সমর। চমৎকার! বলে যাও কবি, বলে যাও—

বাণী। (গম্ভীর হয়ে) আচ্ছা, সাহিত্যিকদের তোমরা দু'চক্ষে দেখতে পার না, কেন বল তো?

সমর। কারণ—আমরা যে-যুগে, যে-প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বাস করছি, তাতে-যে কাব্য করার ফুরসৎ নেই—তা তোমরা মানতে চাও না বলে। তোমরা জান না, এটা হচ্ছে—

বাণী। নিত্য-নতুন মারণাস্ত্র আবিষ্কারের যুগ—তাই, না? তোমরা মৃত্যুর জয়ঘোষণা করছ?

সমর। ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করো না। মৃত্যুর নয়, বিজ্ঞানের জয়ঘোষণা করছি আমরা। আমরা মৃত্যুকে জয় করি। আমরা প্রতিভা।

বাণী। তোমাদের দু'চারজনার প্রতিভা যদি লক্ষ কোটী নরনারীর শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, তা হলে সে প্রতিভাকে তোমরা কী বলো?

সমর। বিজ্ঞানের সে দোষ নয় বাণীকুমার। সে দোষ স্বার্থপর কূটরাজনীতির।

মহা। কিন্তু তারও কি প্রয়োজন নেই, বাণীকুমার?

স্বরাজ। বাণী মনে করে তার প্রয়োজন নেই। ও কবি; জগতে শুধু প্রয়োজন গান আর কাব্য! (মৃদু হাস্য)

বাণী। পরিহাস করছ। দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে সাহিত্যিক কী করতে পারে, তা তোমরা বুঝতে চাও না। সাহিত্যকে বাদ দিয়ে বিপ্লবই বল, আর আন্দোলনই বল, কখনো সার্থক হতে পারে না যে।

সমর। তোমার মধুর-রসে-ভরা ও-নাটকে কল্পনা-বিলাসীদের খোরাক মিলবে, সন্দেহ নেই।

বাণী। আমার নতুন নাটকে আমি তাদের কথা লিখব —অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যারা দলে দলে বরণ করে নেবে নিষ্ঠুর মৃত্যুকে, দেহ তাদের পচবে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে; তবু এ-কথাও জানি—তাদের দুঃখের শর্বরী একদিন নির্বাণ লাভ করবেই—দুর্গম পথে তাদের যাত্রা সফল একদিন হবেই— (প্রস্থান)

স্বরাজ। তা হলে ঐ ঠিক রইল—মহাব্রত, তোমরা প্রস্তুত থাকবে!

মহা। নিশ্চয়। আজ তবে উঠি—জয় হিন্দ্।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মঞ্চ অন্ধকার। কারা যেন সতর্কপায়ে এগিয়ে চলেছে। হাতে তাদের ত্রিরঙ্গা ও চাঁদমার্কা সবুজরঙ্গা পতাকা। আজাদ-হিন্দ-ফৌজের সমরসঙ্গীত গেয়ে চলেছে —'কদম্ কদম্ বঢ়ায়ে যা।' হঠাৎ অন্ধকার পটে দেখা দিল লালচে ভাব। সুরু হয়ে গেল মারামারি। জনতা চেঁচিয়ে উঠল—'ইনক্লাব জিন্দাবাদ'। পুলিশ চালাচ্ছে গুলী। বালক-কণ্ঠের একটা চীৎকার শোনা গেল—]

বিপ্লব। আমাকে তোমরা মারতে চাও, মারো; কিন্তু যতক্ষণ আমার দেহে একবিন্দু রক্ত আছে, ততক্ষণ আমার হাতের নিশান পারবে না কেড়ে নিতে—

[এক মুহূর্ত। পরক্ষণেই গর্জে উঠল রিভলবার। 'নেতাজী'— আর্তনাদ করে বিপ্লব লুটিয়ে পড়ল রাস্তায়···· ····আলো জ্বলে উঠল। হাসপাতাল। আহতের সংখ্যা অগুণতি। একটা 'বেড্'-এ ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা অবস্থায় শুয়ে আছে বিপ্লব। পাশে দাঁড়িয়ে স্বরাজ, মহাব্রত ও ভোলানাথ। কল্যাণী পরিচর্যা করছে আহত ব্যক্তিদের]

ভোলা। (নিম্নকণ্ঠে) বিপ্লব!

বিপ্লব। আমি—আমি এখন কোথায়?

কল্যাণী। ভয় কী? শীগ্‌গিরই সেরে উঠবে তুমি।

বিপ্লব। ভয়! না, না, ভয় কিসের? ভুলে যেও না কল্যাণীদি, আমি দেশের জন্যে মরছি—এর চেয়ে বড় সুখ কি আর আছে! (শেষ নিশ্বাস পড়ল)

আগ্নেয়গিরি! ঘুমায়ে থেকো না আর—

অনিলবরণ চট্টোপাধ্যায়—চতুর্থ বর্ষ, সাহিত্য

ভৈরব রবে বিষাণ উঠেছে বেজে
হে রুদ্র, তব ধ্বংস-বহ্নি জ্বালো।
আগ্নেয়গিরি—ঘুমায়ে রয়েছে সে যে,
মৃত্যু-গরল ঢালো আজ তুমি ঢালো।

শোননি কি তুমি শত হাহাকার ধ্বনি
লক্ষ কণ্ঠে দীর্ণ দীর্ঘশ্বাস ?
শোননি কি ক্ষুধা-মৃত্যু-কাতর বাণী
অত্যাচারীর তীব্র অট্টহাস ?

শৃঙ্খলাহত লাঞ্ছিতা মাতা কাঁদে—
শুনিতে পাও না, শুনিতে পাও না কিরে ?
নীরব তবুও! ভাঙো ভাঙো কারাগার
মুক্তি বিতর বন্দিনী জননীরে।

আগ্নেয়গিরি! ঘুমায়ে থেকো না আর
অনলোচ্ছ্বাসে জ্বলো আজ তুমি জ্বলো;
বিপ্লব আনো, ভাঙো হে বন্ধ দ্বার
শাসন-শোষণে চরণে সবেগে দলো।

জ্বালাও অমল দীপ্ত সে হোমশিখা
উল্কার বেগে ছুটে চলো দুর্বার—
মাভৈঃ! ললাটে বিজয়-তিলক লিখা,
মৃত্যু আসুক—আসুক অত্যাচার।

অন্ধ-রাতের অন্ধ-পিছল পথ ?
হোক—তবু নাহি ভয়,
হে রুদ্র, তবু থামিবে না তব রথ
হবে জয়—নিশ্চয়।

জাগো জ্যোতির্ময়

[দৃশ্যনাট্য]

পীযূষকান্তি চট্টোপাধ্যায়—চতুর্থ বর্ষ, সাহিত্য

—ঃ জ্যোতির্বর্গ ঃ—

ভোলানাথ....দার্শনিক
বাণীকুমার....কবি
স্বরাজ....রাজনৈতিক কর্মী
মহাস্বত....   ঐ
সমরবন্ধু...বিজ্ঞানী
বিপ্লব...জনৈক বালক
ভারতী....মা
কল্যাণী....সেবাব্রতী

—•—

প্রথম দৃশ্য

[রাত শেষ হতে বেশি দেরি নেই তখন। প্রকৃতি নিশ্চিন্ত সুষুপ্তিতে মগ্ন। ধীরে ধীরে অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। স্বরাজ আর মহাস্বতকে আবছা দেখা যাচ্ছে—বসে বসে মৃদুস্বরে কিসের আলোচনা যেন করছিল। এমন সময়ে আবৃত্তি করতে করতে ঢুকল বাণীকুমার]

'দেশ দেশ পরিল তিলক রক্তকলুষগ্লানি,
তব মঙ্গলশঙ্খ আন, তব দক্ষিণপাণি,
তব শুভ সংগীতরাগ
তব সুন্দর ছন্দ।'

মহা। আঃ, জ্বালালে দেখছি।

[আবৃত্তি বন্ধ হয়ে গেল। বাণীকুমার ছুটে গিয়ে জানলাটা খুলে দিল। আকাশ ফরসা হয়ে গেছে। ঘরের সমস্তটা এবারে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।]

বাণী। ও—তোমরা? স্বরাজ আর মহাস্বত ?

স্বরাজ। হ্যাঁ, আমরা। এখন তোমার ওই ছন্দ আর সঙ্গীত একটু থামাও দিকি বাপু!

বাণী। কাল একটা নাটক লিখতে সুরু করেছি ভাই।

মহা। নাটক!

কল্যাণী। তুমি কী, বাণীদা? এখানে জ্বলছে আগুন, আর তুমি চললে মনের সুখে বেহালা বাজাতে?

বাণী। (মুচ্‌কি হেসে) ইতিহাসে তার নজির আছে, কল্যাণী। (প্রস্থান)

[জনতার কোলাহল ভেসে এল—'ইনক্লাব জিন্দাবাদ', 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'—]

কল্যাণী। উত্তেজিত জনতা ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে—

ভোলা। আমিও যাই—

কল্যাণী। কোথায় যাবে তুমি?

ভোলা। (উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে) আমার যেতেই হবে; আমি যে স্বপ্ন দেখেছি—The dream of a new Life—the Life beyond Death—মৃত্যুর অতীতে এক মহাজীবন। ঐ যে ভেসে আসছে সঙ্গীতসুর। বাজাও কবি—তোমার বীণার সব কটা তার একসঙ্গে উঠুক আর্তনাদ করে—বীণাতারে তোল তুমি রুদ্রের ঝঙ্কার। বিজ্ঞানী! রাজনীতিক! নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক তোমার-আমার স্বার্থে-ভরা এ ক্ষুদ্র জগৎ, চাই না এ সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীতে বদ্ধ থাকতে। আলো দাও—মুক্তি দাও,—কবি! তোমার মুক্তির গান গাও—(টলতে টলতে প্রস্থান)

[বেহালা হাতে বাণীকুমার এসে গান ধরল]

বাণী।
আমি নূতনের গান গাই—
নবীন-জীবন-গাথা রচিবারে
অভয় মন্ত্র চাই।
তরুণেরা চঞ্চল উঠেছে জেগে
রুদ্রের নর্তন পবনে মেঘে
আগুনেরি বন্যা আসিয়াছে ওই—
মুক্তি চাই, মুক্তি চাই॥

[গাইতে গাইতে বাণীকুমার চলে গেল। কল্যাণী দাঁড়িয়ে রইল একা। আলো নিভে এল ধীরে ধীরে।....

....আবার আলো জ্বলে উঠল। ঘরে শুয়ে আছে মুমূর্ষু ভোলানাথ। তার চারপাশে ঘিরে ভারতী, কল্যাণী, বাণী, স্বরাজ, মহাব্রত ও সমরবন্ধু দাঁড়িয়ে। সকলেই নির্বাক]

ভোলা। ভোর হয়ে এসেছে, না? আমার শিয়রের কাছের এই জানলাটা একটু খুলে দাও না, মা—

[ভারতী জানলাটা খুলে দিলেন। আকাশ ফরসা হয়ে গেছে। সেই দিকে তাকিয়ে রইল নিষ্পলক নেত্রে]

ভোলা। ওই কেটে গেল দুঃখের রাত্রি—একটু পরেই অরুণালোকে রাঙিয়ে দেবে আকাশটাকে। জানি, স্বাধীনতা-সূর্যও উঠবে পূব-গগনে। কিন্তু সেই গৌরবোজ্জ্বল মুহূর্তে তাদের তোমরা স্মরণ ক'রো—ভারতের মুক্তি-যজ্ঞে হাজারে হাজারে যে-সব নরনারী দিয়েছিল আত্মাহুতি;—তাদের ভুললে ত' চলবে না ভাই।

কল্যাণী। (উদ্গত অশ্রু গোপন করে) ভোলাঠাকুর—

ভোলা। দুঃখ ক'রো না কল্যাণী। ওরা আমায় মেরেছে—সত্যি; কিন্তু আমার আদর্শ? তা ত' মরবে না কোনদিন। যে-প্রেরণা আজ সমস্ত দেশবাসী পেয়েছে, তার মধ্যেই ত' আমি চিরদিন থাকব অমর হয়ে। মরণকালের এই শেষ জানাই হবে আমার অনন্তযাত্রার পাথেয়। সাথীরা, আমায় এবার বিদায় দাও তোমরা। মা, তোমায় করে যাচ্ছি শেষ-প্রণাম। বন্দেমাতরম্।

[সব শেষ হয়ে গেল]

বাণী। ওই যে, পূব-আকাশে দেখা দিয়েছে রবিরশ্মি। আমাদের যাত্রা সুরু করার আগে, এস—ভারতী মায়ের পদধূলি নিয়ে যাই।

ভারতী। বৎসগণ! আজ কল্যাণীর সেবাব্রতের স্পর্শে শুদ্ধ হোক সমরবন্ধুর বিজ্ঞান; স্বরাজ আর মহাব্রত দু'ভাই পরস্পরকে করুক আলিঙ্গন; আর, ভোলানাথ—সে মরে নি, তার প্রেমিক মনের রূপায়ন দিক্ বাণীকুমারের কণ্ঠসঙ্গীত।

[ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে আসছে। বাণীকুমার, কল্যাণী, স্বরাজ, মহাব্রত ও সমরবন্ধু—'বন্দেমাতরম্' গান গাইতে গাইতে চলেছে। ক্রমে তাদের সঙ্গীতধ্বনি অস্পষ্ট হতে হতে দূরে মিলিয়ে গেল। যবনিকা এল নেমে।]

কল্যাণী। (চীৎকার করে) বিপ্লব!

ভোলা। ওকে আর ডেকো না, কল্যাণী। নিজেকে পুড়িয়ে যে আলো 'ও' আজ জালিয়ে দিয়ে গেল, আগামী কালের যাত্রীরা সে-আলোতেই চিনে নেবে তাদের মুক্তিপথ।

[মঞ্চে অন্ধকার নেবে এল। অন্ধকার মেখে মেখে দেখা যাচ্ছে অগ্নি-আভা। রক্তনেশায় উন্মত্ত দু'দল। একদলের মুখে শোনা যাচ্ছে 'বন্দেমাতরম্', আরেক দলের মুখে 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'। একদল বলে ওঠে—'ঐ, ঐ যে—মার্ শালাকে'; আরেকদল বলে—'আয় নেড়ে, দেখাচ্ছি মজা।'....

....আলো জ্বলছে ঘরে। খোলা জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে অন্ধকার আকাশের রক্তিমা। বাইরে এখনো চলছে হানাহানি। মাঝে মাঝে জেগে উঠছে অসহায়ের বিপুল আর্তনাদ। অস্থির মনে ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন ভারতী। কণ্ঠধ্বনি ভেসে আসছে—]

'আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে,
আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিস্ফল মাথা কুটে।'

ভারতী। (চেঁচিয়ে উঠলেন) ওরে, কে আছিস্ ওদের ডাক্, ওরা যে ভায়ে ভায়ে মারামারি করছে রে—ওদের ডাক্—ওদের বুঝিয়ে বল্—

[আলো নিভে গেল। কিছুক্ষণ বাদে যখন জ্বলে উঠল, ঘরে তখন স্বরাজ, মহাব্রত আর ভারতী]

ভারতী। সেদিন তোরা দুজনে মিলে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে করেছিলি মৃত্যুপণ সংগ্রাম আর আজকে তোরা ভায়ে ভায়েই—

মহা। কেন, পাকিস্তান তো আমাদের এমন কিছু অন্যায় দাবী নয়।

স্বরাজ। অন্যায় নয়? আচ্ছা, তুমিই বল মা,—আজ যদি মহাব্রত এসে আমায় বলে—মা আমাদের দু'জনেরই; মায়ের ওপর আমার অংশটা আমায় ভাগ করে দাও, তোমারটুকু নিয়ে তুমি পৃথক হয়ে থাক,—আচ্ছা, তখন কি সত্যিই আমি তোমায় ভাগ করতে বসে যাব, মা?

ভারতী। (স্নেহকণ্ঠে) মহাব্রত!

মহা। (অনুতপ্ত স্বরে) আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি, মা। আর কখনো এমন দাবী আমরা করব না। তুমি আমায় বিশ্বাস কর, মা—

[ভারতী উভয়ের গায়ে আশীষ-হস্ত বুলিয়ে দিলেন]

স্বরাজ। তবে চল মহাব্রত, হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শক্তি নিয়ে আরেকবার শেষ চেষ্টা করে দেখি গে'—স্বাধীনতা আমরা ফিরিয়ে আনতে পারি কি-না।

তৃতীয় দৃশ্য

[গভীর রাত। আলো বেশি নেই। কল্যাণী ও ভোলানাথ। উভয়ের চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা। বাণীকুমারের প্রবেশ]

বাণী। Watchman, what of the night? রাত্রির আর কত বাকী?

ভোলা। বেশি দেরি নেই, কবি। প্রমাণ চাও? এগিয়ে এস এদিকে।—দেখতে পাচ্ছ? সমস্ত আকাশটা লালে-লাল হয়ে উঠেছে? এক্ষুণি ঝড় উঠবে বলে আশঙ্কা হচ্ছে।

কল্যাণী। শুনতে পাচ্ছ, কবি?

বাণী। কী?

কল্যাণী। ভেসে আসছে একটা উন্মত্ত গর্জন?

বাণী। সাগরের ঊর্মি যে মুখর হয়ে উঠেছে—

কল্যাণী। বুঝতে পাচ্ছ, দিগন্তে তাণ্ডবতার আভাষ?

বাণী। নটরাজের রুদ্রনৃত্য সুরু হয়েছে, যেন—

কল্যাণী। বাতাসই-বা অমন উত্তাল হয়ে উঠল কেন?

বাণী। মহাপ্রলয়ের সূচনা—আর কিছু নয়, কল্যাণী।

ভোলা। ওই দেখ—রাজধানীতে আগুন জ্বলে উঠেছে।

বাণী। শুধু রাজধানীতে নয়। ভারতের প্রতিটি শহরে, প্রতিটি পল্লীতে এমনি ধু ধু করে জ্বলে উঠেছে আগুন।...কিন্তু আর সময় নেই, আমি যাই—

কল্যাণী। পালাবে?

বাণী। না, বেহালাটায় আজ একটা নতুন তান ধরব।

গেলুম। বই নিলুম একখানা। বাঙলাদেশের একজন বিখ্যাত লেখকের লেখা। বইয়ের পাতাগুলো উল্টে ছেলেদের যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা চোখে পড়লো। বাঙলা-দেশের দুর্ভাগ্য, নইলে কেন যে এই মূল্যবান সমালোচনা কোথাও ছাপে না, তা বুঝতে পারি না। বেচারারা আর কি করে, তাই তো বইয়ের পাতায় কলম চালায়। সমালোচনা পড়ব, না বই পড়ব ভেবে পেলুম না। এই সব সমালোচকেরা যে কালে উন্নতি করবে তাতে আর সন্দেহ নেই। কারণ তাঁদের সমালোচনার তীব্র আক্রমণে লেখক নিজে কেন, তাঁর চৌদ্দ পুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার পেয়ে গেছেন। ঘন্টা পড়লো। ক্লাশের দিকে রওনা হলুম।

এবার যে প্রফেসর আসবেন তিনি খুব ভালমানুষ। তাই তাঁর ক্লাশে আমরা বেশী গোলমাল করি। কিন্তু প্রায় আধ ঘন্টা কেটে গেল। শোনা গেল তিনি অনুপস্থিত। কেউ বেড়াল ডেকে, কেউ গরু, ছাগল ডেকে হৈ হৈ করে ক্লাশ থেকে বেরিয়ে এলুম। পাশের ঘরে তখন ক্লাশ হচ্ছিল।

গেটের এক পাশে "ডাব", "গরম মুড়ি"। আরেক পাশে "এই যে চললো অবাক জলপান।" আমাদের দেখে তাদের গলার স্বর সপ্তমে চড়ে গেল। পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকানে ছাত্রের ভিড় জমলো। কলেজের পাশের রাস্তা ধরে ফিরে চললুম। আজ এই শেষ। কাল আবার আসব। হবে একই জিনিষের পুনরাবৃত্তি।

অমিত রায় চৌধুরী—দ্বিতীয় বর্ষ, সাহিত্য

আধুনিক বাঙলা সাহিত্যঃ

সাহিত্যের সংজ্ঞা সম্বন্ধে আধুনিক বাঙলা সাহিত্য সচেতন নয়। সমাজের সংগে তার সম্বন্ধ নিবিড়—এই চিরদিনের সত্যটাকে ভুলে যাচ্ছে আমাদের আধুনিক যুগের সাহিত্য। আজকালকার সাময়িক পত্রিকাগুলোর দিকে তাকালেই কথাটা সত্যি কি মিথ্যে বোঝা যাবে।

আধুনিক লেখকরা যে সকলেই সমাজকে অস্বীকার করেছেন তা নয়। কারণ বাঙলা সাহিত্যে এখনও তারাশঙ্করের মতো সমাজ-সচেতন লেখক রয়েছেন। কিন্তু তাঁরা ক'জন? তাঁদের কয়েকজনকে বাদ দিলে আর সকলেই-তো সমাজ সম্বন্ধে অচেতন।

যুদ্ধ রাশিয়া ও চীনের সামাজিক জীবনে এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করেছে। যেমন সামাজিক জীবনে আঘাত লাগলো তেমনি এ দুটি দেশের সাহিত্যেও আলোড়নের সৃষ্টি হোল। কবি, সাহিত্যিক—তাঁরাও সমাজের। সুতরাং তাঁরা নিজের চোখে যা দেখলেন তা চেপে যেতে পারলেন না। এই কঠিন বাস্তবকে, এই মহাসত্যকে তাঁরা অস্বীকার করতে পারলেন না। যা তাঁদের শিল্পীমনকে ব্যথাতুর করে তুললো তাকে তাঁরা নিজেদের শিল্প-নৈপুণ্যের দ্বারা সাহিত্যে স্থায়ী করে রাখলেন। এর ফলে সৃষ্টি হোল বহু সার্থক উপন্যাস, গল্প ও কবিতার।

এই যুদ্ধ রেহাই দেয়নি আমাদেরও। তেরশ পঞ্চাশে এলো মহা-মন্বন্তর। আমাদের সামাজিক জীবনেও দেখা দিলো পরিবর্তন। পঞ্চাশ লক্ষ লোক আমাদের চোখের সামনে না খেতে পেয়ে মারা গেল। কিন্তু আমাদের সাহিত্যে তো তেমন কিছু আলোড়নের সৃষ্টি হোল না, নতুনতর অধ্যায়ের সূচনা তো হোল না। আমাদের ক'জন লেখকের মন এতে বেদনা পেল? অনেক লেখকই তো তাঁদের সীমাবদ্ধ গণ্ডিটুকু অতিক্রম করতে পারলেন না। রোমাণ্টিক শিল্পী-মন অস্বীকার করলো এই কঠিন বাস্তবকে।

সমাজ-সচেতন কয়েকজন এবং দু'একজন রোমাণ্টিক লেখক এই ভয়াবহ মন্বন্তরকে সাহিত্যে স্থায়ী করে রাখবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য! তাঁরা মন্বন্তরের পটভূমিকায় যা সৃষ্টি করলেন তার মধ্যে মাত্র কয়েকটি হোল সার্থক সৃষ্টি।

মন্বন্তরের পটভূমিকায় লেখা ছোট গল্পগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য—রোমাণ্টিক লেখক মনোজ বসুর ('বনমর্মর'

আলাপ-আলোচনা

কলেজে কয়েক ঘণ্টা ঃ

কলেজের প্রবেশ পথ। টুলে বসে দরয়ান। মাথায় টাক, কাঁচা পাকা গোঁফ। গেট পেরিয়ে দালানে উঠি। সামনে ঝুলছে নোটিশ বোর্ড। আজ বড় ভিড় এখানে। বোধ হয় গুরুতর কিছু আছে। ভিড়ের মধ্য থেকে উঁচু হয়ে দেখবার চেষ্টা করি। কিন্তু বৃথা। চেনা ছেলে একজন বেরিয়ে আসে। গম্ভীর মুখে বলে, "পরীক্ষা আসন্ন—নোটিশ দিয়েছে।" দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে লাইব্রেরিতে গিয়ে দাঁড়ালুম। কে যেন ঘন ঘন কাশছে। সামনের দেয়ালে লেখা "Silence please". এখনো ঘণ্টা পড়তে কিছু বাকী। ভাবলুম বই পড়ি। কাউণ্টারের কাছে এলুম। একটি ছেলে যতবারই যে বই-ই চাইছে, ততবারই উত্তর হচ্ছে "এ বই তো বাড়ীতে দেওয়া হয় না। এখানেই পড়তে হয়।" ছেলেটি রেগে বলে, "বই দেওয়ার জন্য কেন এ কার্ড করা হয়েছে?" সত্যিই তো; না করলে কত কাগজ বাঁচত! কর্ত্তারা কী খুসীই না হোত! বই একখানা নিয়ে পড়তে বসলুম। বইখানা নতুন বাঁধিয়ে এসেছে। সুন্দর বাঁধানো। লেখকের নাম-ধাম সবই আছে। জ্ঞানের খোরাকও আছে অনেক। নেই কেবল সামনের দু'খানা ও শেষের চারখানা পাতা। যাই হোক, পড়বার চেষ্টা করলুম।

ঘণ্টা পড়লো। সিঁড়ি বেয়ে একদম তেতালা। ক্লাশে গিয়ে বসলুম। ওপাশে কতগুলি ছেলে কী নিয়ে যেন হৈ চৈ করছে। কাছে গিয়ে জানলুম একটা মাথার কাঁটা। কোন ছাত্রীর খোঁপা থেকে পড়ে গেছে। কিন্তু আমার মনে হয় ও-কাঁটাটা কোন ছাত্রীর না হয়ে কলেজের ঘর-ঝাড়-দেওয়া কোন ঝাড়ুদারনীরও তো হতে পারে! খাতা হাতে প্রফেসর আসেন। রোল-কল সুরু হয়। ইয়েস স্যার, প্রেজেণ্ট স্যার, জয় হিন্দ্ প্রভৃতিতে ক্লাশ ভরে যায়। বিরস মুখে প্রফেসর নীরস লেকচার দিয়ে যান। এক কান দিয়ে শুনে আর এক কান দিয়ে বার করে দি। মনের উপর কোন ছাপই পড়ে না। এর পর আর একটা ক্লাশ। ঘর বদলান হয়। সুরু হয় প্রফেসরের লেকচার। "Wordsworth" সম্বন্ধে। বেশ পড়িয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন—"এই যে "Practical Wordsworth". হাসির রোল উঠল ক্লাশে। চেয়ে দেখি আমাদের একজন বন্ধু—গোলাপ ফুলের মধ্যে চাঁপা ঢুকিয়ে নাকের কাছে ধরে আছে!

এই পিরিয়ডটা অফ্। সিঁড়ি দিয়ে নেবে কমন-রুমে এলুম। ঘরে ঢুকতেই চোখে পড়ে ঘড়িটা। খুব ভাল ঘড়ি। কোনদিনই ঠিক চলে না। ওটা নিয়মিত অনিয়ম দিচ্ছে। ঘরের এ পাশে তুমুল ক্যারম খেলা হচ্ছে। কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। চওড়া কার্পেট। খেলোয়াড়রা তাতে খেলতে বসেছেন। তাঁদের জুতোর তলা খুব পরিষ্কার, ওপরটা বেশ চকচকে। তাই সেগুলোকেও কার্পেটে এনে পাশে বসিয়েছেন। জুতোর পাশেই তাঁদের বই। মা সরস্বতীর প্রতি আমাদের অসীম ভক্তি। কাগজ পড়বার জন্য ওপাশে গেলুম। আস্ত কাগজ পেলুম না কোনখানে। একপাতা কাগজ এখানে পড়ে' তার পরের পাতা পড়তে হলে, সারা কমন-রুম খুঁজে বেড়াতে হবে। অমৃতবাজারের একটা পাতা দেখলুম বেঞ্চির তলায়। অনেকে পদধূলি দিয়েছেন তার উপর। পাতা পড়া শেষ হলো। কিন্তু পরের পাতা? সামনেই দেখি একটি ছেলে পরের পাতাটা হাতে নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছেন। কাছে গিয়ে বললুম "আপনি তো গল্প করছেন, দেবেন কাগজটা?" "কই, না—এই যে পড়ছি।"—তিনি কাগজে মন দিলেন। একটু এগিয়ে গিয়ে, ফিরে দেখি তিনি আবার গল্প করছেন। যাক। হঠাৎ মনে হলো আজ বই নেবার দিন। কার্ডটা হাতে নিয়ে এগিয়ে

দেবপূজা, সে তো দুর্বলের ভয়সংজাত পূজা। সর্পভয় হোতে রক্ষা পাবার জন্য যে মনসাপূজা, সে তো প্রবলকে ঘুষ দিয়ে তুষ্ট করবার দুর্বল প্রয়াস। সত্যনারায়ণের, লক্ষ্মীর পূজা কোরে মানুষ তো চায় অর্থ, চায় দারিদ্র্যের অবসান। ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারীর হাত হোতে বাঁচবার জন্যই না ওলা-বিবি, শীতলাষষ্ঠীর পূজা? এর মধ্যে আত্মার সেই বিরাট বিকাশ কোথায়, ধর্মের সে উদার প্রসারতা কোথায়? এর মধ্যে কোথায় সে গীতা বেদ উপনিষদের উদাত্ত ধর্মবাণী—মানুষকে ডেকে যা' বলে—"চরৈবেতি, চরৈবেতি, চরৈবেতি", "তমসো মা জ্যোতির্গময়", বলে—"শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ.... বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্," এই বোলে যা' সাবধান কোরে দেয় অহংকারী মানবকে—"কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন," যা শোনায় বীর্যের বাণী—'হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্"? রবীন্দ্রনাথ তাঁর "মানুষের ধর্মে' যে কথা বলেছেন সে কথার প্রভাব কোথায় এই লৌকিক ধর্মে?

মনে হয় বেদ-উপনিষদ-গীতার ধর্ম সীমাবদ্ধ ছিল কতিপয় উচ্চ শিক্ষিত সংস্কৃতিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর এবং জনসাধারণ বোধ হয় এ জ্ঞান হোতে ছিল বঞ্চিত—যার জন্য এ কথা ছড়িয়ে পড়েছে—"ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।" মধ্যযুগে যে সব ধর্মবীরের আবির্ভাব হয়েছিল এই সব ধর্মতত্ত্বকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত করতে, তাঁরাও লোভ ও কামনামূলক লৌকিক দেবপূজার অসারতা সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে কোনো চেতনার সঞ্চার করতে পেরেছেন বোলে মনে হয় না। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে যে ধর্মে বাণী প্রচার করা হয় সাড়ম্বরে, তার কোনো বিশেষ পরিচয় লৌকিক ধর্মে পাওয়া যায় না। তবুও আমরা সগর্বে বলি, 'ভারতবাসী ধর্মপ্রাণ'!

শচীনন্দন সিংহ—চতুর্থ বর্ষ, সাহিত্য

অধ্যাপক সঙ্ঘ সংবাদ

আমাদের কলেজের 'পরিচালক সমিতির' প্রবীণ সদস্য শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাধিনায়ক পদে বৃত হওয়ায় 'অধ্যাপক সঙ্ঘের' তরফ থেকে গত ২৪শে মার্চ, '৪৬ আমরা তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের অভিলাষে কলেজ-গৃহে একটি সভার আয়োজন করেছিলাম। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়।

অধ্যাপিকা শ্রীঅরুন্ধতী সেনের 'বন্দে মাতরম্' গান, অধ্যাপক শ্রীশিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের আশীর্দীপ্ত সংস্কৃত বক্তৃতা, অধ্যাপক শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়ের স্বরচিত বাঙ্‌লা কবিতাপাঠ, অফিস বিভাগের সহকর্মী শ্রীজগদীশ চক্রবর্তীর অভিনন্দনবাণী পাঠ—সভাস্থ বিদগ্ধবর্গকে বিশেষ আনন্দ দান করেছিল।

প্রিন্সিপ্যাল সিংহ এবং ভাইস্ প্রিন্সিপ্যাল মুখোপাধ্যায় সর্বাধিনায়ক প্রমথবাবুকে আনন্দাভিনন্দন জ্ঞাপন করে' যথাক্রমে বাঙ্‌লা ও ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা করেছিলেন। অভিনন্দনের উত্তরে প্রমথবাবু সরল বঙ্গভাষায় প্রায় পঁচিশ মিনিট বক্তৃতা করেছিলেন। 'ইংরাজি যদি ভুলে যাই' —তিনি বলেছিলেন—'লজ্জা করবো না। আমার ছোট ভাই শ্যামাপ্রসাদ এবং নির্মলচন্দ্রের (এন. সি. চ্যাটার্জী, বার-এট্-ল—কলেজের 'পরিচালক সমিতির' সম্পাদক) প্রভাবে আমি বাঙ্‌লা ভাষাকে ভালোবাসতে শিখেছি। ....বাঙ্‌লাদেশে আজ বাঙ্‌লাভাষার গৌরব ও মর্যাদা আমরা যদি না দেব, তবে কে দেবে? অবশ্য মহাত্মা গান্ধী বাঙালী না হয়েও বাঙ্‌লা শিখতে বসেছেন এই বৃদ্ধবয়সে। সেদিন সোদপুরে গিয়ে দেখি—তিনি বাঙলার প্রথম ভাগ

যাঁর লেখা) 'দ্বীপের মানুষ', নতুন লেখক নবেন্দু ঘোষের 'কঙ্কি', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নক্রচরিত' ও প্রবোধ সান্যালের 'অঙ্গার'।

উপন্যাসও কয়েকটি লেখা হয়েছে। তারাশঙ্কর লিখলেন 'মন্বন্তর'। কিন্তু 'মন্বন্তরে' তাঁর নিজের বৈশিষ্ট্যটুকুই তাঁর অগোচরে ফুটে উঠেছে। মন্বন্তরের কাহিনী 'মন্বন্তরে' মুখ্য না হয়ে গৌণ হয়ে উঠেছে। সুবোধ ঘোষের 'তিলাঞ্জলী'-ও ব্যর্থ সৃষ্টি। মন্বন্তরকে তেমনভাবে আমাদের লেখকরা সাহিত্যে রূপ দিতে পারলেন না।

মন্বন্তর নিয়ে ছোট থেকে বড়ো, নতুন থেকে প্রাচীন সব কবিই কবিতা রচনা করেছেন। কিন্তু তেমন কবিতা একটিও তাঁরা লিখতে পারলেন না যার উল্লেখ করা যেতে পারে। আধুনিক অনেক প্রতিভাবান কবিও কবিতা লিখেছেন কিন্তু তাঁদের কবিতায় প্রতিভার কোন স্বাক্ষর খুঁজে পাওয়া যায় না। মন্বন্তরের পটভূমিকা নিয়ে কবিতা রচনা করতে গিয়ে যেন তাঁদের শক্তি ও প্রতিভা নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে।

তাই দেখি, কী উপন্যাস কী কবিতা, সাহিত্যের কোন বিভাগই মন্বন্তরকে সাহিত্যে স্থায়ী করে রাখতে পারলো না।

গোপাল ভট্টাচার্য—দ্বিতীয় বর্ষ, সাহিত্য

ধর্মপ্রাণ ভারত !

বারব্রত, লক্ষ্মীপূজা, ষষ্ঠীপূজা, মনসাপূজা—এ সকলের লক্ষ্য কী? প্রত্যেক পূজার মূলে আছে লোভ, আছে কামনা, আছে বিপদ হোতে উদ্ধার পাবার জন্যে আকুল আকুতি। লক্ষ্মীপূজার ফলে পাওয়া যায় নাকি গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ, বাগানভরা ফল! ষষ্ঠীপূজার ফলে নাকি বন্ধ্যার কোল আলো করে আসে স্বর্গের দেবদূত। —মৃতবৎসার সন্তান নাকি মৃত্যুর হাত হোতে পায় রক্ষা! মনসাপূজায় সর্পভয় দূরে যায়। ব্রতপালনেরও মূল উপজীব্য তাই। বিবিধ ব্রতপালনে কুমারী পায় রামের মতো স্বামী, লক্ষ্মণের মতো দেবর, কৌশল্যার মতো শাশুড়ী আর দশরথের মতো শ্বশুর; গৃহিণীর স্বামি-পুত্র কল্যাণে থাকে, দারিদ্র্য দূরে যায়, সংসারে অখণ্ড শান্তি বিরাজ করে। বারব্রত পালন কোরে দানধর্ম করার পুণ্যে হয় অক্ষয় স্বর্গলাভ।

এইভাবে আমরা দেখছি, বিপদে পড়লেই মানুষ ভগবানকে ডাকছে। বিপদ হোতে উদ্ধার পেলে বলছে, ভগবান আছে; আর না পেলেই ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করছে। আর এই ভগবদ্‌ভক্তির মূলে আছে লোভ, আছে কামনা। কামনা ও লোভমূলক এই যে বারব্রতপালন বা মানত করা, একেই জনসাধারণ পবিত্র ধর্ম নামে আখ্যা দিয়েছে; এবং এই ধর্ম যারা পালন করে, তারাই হয় নিষ্ঠাবান ধার্মিক। লৌকিক দেবদেবীতে আস্থাবান বোলেই বোধ হয় ভারতবাসী ধর্মপ্রাণ। মেয়েরা নাকি একান্ত ধর্মপরায়ণা এবং প্রাচীনপন্থী ভারতীয় সগর্বে প্রচার করেন যতোদিন ভারতীয় নারী আছে ততোদিন ধর্মের জ্যোতি ম্লান হবে না। কিন্তু মেয়েদের ধর্মপালনের প্রধান পন্থা বারব্রত পালন। এই বারব্রত পালনকেই সাধারণে ও নারীসমাজ ঋষিনির্দিষ্ট ধর্ম বোলেই একান্ত বিশ্বাসে মান্য কোরে আসছে। এই সব তথাকথিত ধর্মপালনের মধ্যে কি গীতা উপনিষদ কথিত ধর্মের চিহ্ন পাওয়া যায়? কর্মফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ কোরে যে নিষ্কাম ধর্মের কথা শ্রীকৃষ্ণ প্রচার করেছেন, এ কি তারই নমুনা? উপনিষদে যে আদিত্যবর্ণ জ্যোতির্ময় মহান্ পুরুষের সন্ধান পাওয়ার কথা আছে তার কোনো নিদর্শন কি লৌকিক ধর্মে আছে? তবে ভারতবাসীর ধর্মপ্রাণতা সম্বন্ধে কেন এত জোর গলায় প্রচার করা হয়? বিচারের স্রোতোপথ-গ্রাসকারী আচারের মরুবালুরাশিকেই যদি ধর্ম আখ্যা দেওয়া হয় তবে অবশ্যই ভারতবাসী ধর্মপ্রাণ। কিন্তু যখন আমরা ভারতবাসীর ধর্মপ্রাণতা সম্বন্ধে আলোচনা করি তখন বেদ-উপনিষদ-গীতার আশ্রয় গ্রহণ করি, অথচ আশ্চর্যের বিষয় ভারতবর্ষীয় সমাজের চিত্রের সংগে তার কোনো সামঞ্জস্য নেই। সাধারণ গ্রামবাসীর যে ধর্মপালন, যে

সপ্তাহে তিনদিন, কি চারদিন আমরা চা-চক্রের আনন্দ-সভায় যোগদান করে' অমৃতপানে 'অমর হই'। আমাদের অনুরোধ—সম্পাদক মহোদয় আমাদের প্রতি আরো একটু কৃপাদৃষ্টি বিতরণের ব্যবস্থা করুন। সুধাপানে যাঁরা তৃপ্ত, ক্ষুধা অবশ্য তাঁদের থাকে না! কিন্তু সুধাপানের অব্যবহিত পূর্বে ক্ষুধা-প্রশমনকারী কিঞ্চিৎ 'খাদ্যবিশেষ' বিতরণ করার বন্দোবস্ত কি হতে পারে না?

• • •

কলেজ পত্রিকার সম্পাদকবর্গের পরিচালক হিসাবে অধ্যাপক অমিয়রতনের কার্যকাল এই সংখ্যা প্রকাশ করে' শেষ হলো। এই বৎসর পত্রিকা পরিচালক নির্বাচিত হয়েছেন সুতরুণ অধ্যাপক শ্রীযুত কাত্যায়নীদাস ভট্টাচার্য। শ্রীযুত ভট্টাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। অল্প সময়ের মধ্যেই ছাত্রছাত্রীমহলে তিনি অধ্যাপনার গুণে বিশেষ কৃতিত্ব-ও অর্জন করেছেন। দর্শনের ছাত্র ও অধ্যাপক হলেও বাঙ্‌লা ও ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর গভীর অনুরাগ আছে। তাঁর পরিচালনায় পত্রিকার তারুণ্য আরো উজ্জ্বল প্রভায় প্রকাশিত হ'ক। নবতম শিক্ষা ও সুন্দরতম সৃষ্টির অনুরাগে কলেজ-পত্রিকার মধ্য দিয়ে আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় ছাত্রছাত্রীদল আত্মবিকাশের উদয়শিখরে আরোহণ করুন আনন্দে—সমবেতভাবে আমরা এই কামনা জ্ঞাপন করছি।

পুস্তক-পরিচয়

অ. র. মু.

Why to Live : by Rampada Maity, B.A., B.T. Orient Book Company, 9, Shyamacharan De Street, Calcutta.

নীতি বিষয়ে লেখা কতকগুলি ইংরেজী প্রবন্ধের সমষ্টি। প্রবন্ধগুলি সুলিখিত। ভারতীয় ধর্মবোধ ও দর্শনবিশ্বাসের প্রভাব রচনাগুলির প্রতিছত্রে প্রমূর্ত। লেখকের ভাষা বেশ সহজ ও সরল—স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও বুঝতে পারবে বলে' আমাদের ধারণা। যুগোপযোগী কোনো সস্তা কথা এতে নেই—সুতরাং আধুনিক তরুণেরা এই জাতীয় রচনায় আনন্দ পাবে কি-না বলা শক্ত। তবে প্রচুর সত্যকথা এতে আছে, এবং চিন্তাশীল ছাত্রছাত্রীদের এই কথাগুলি যে ভালো-ই লাগবে, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

আপ-টু-ডেট্: (৪র্থ সংস্করণ): শ্রীযামিনীমোহন কর, এম্-এ: ডি. এম্. লাইব্রেরী, ৪২নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

ইংরেজী নাম হলেও অধ্যাপক শ্রীযামিনীমোহনের লেখা একখানি বাঙ্‌লা প্রহসন। যামিনীমোহনের রচনা তরুণ সাহিত্যরসিক মহলে ইতিপূর্বেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আলোচ্য প্রহসনখানি রসিকমহলে যে যথোচিত সমাদর লাভ করেছে, এর ৪র্থ সংস্করণ-ই সে-সংবাদের সাক্ষ্য দিচ্ছে। যামিনীমোহনের শ্লেষ ও পরিহাস-রসিকতা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচায়ক। হাস্য-রসাত্মক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যের দ্বারা মানবচরিত্রের বহু গোপন দিক তিনি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করে তুলতে পারেন। আলোচ্য প্রহসনগুলি যামিনীমোহনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা বলে আমাদের ধারণা। এ-খানি যে-কোনো প্রথম শ্রেণীর মঞ্চে অভিনীত হবার যোগ্য।

শ্রীকান্ত প্রথম পর্বের ভূমিকা: শ্রীমাখনলাল মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, পি-আর-এস; পাইওনিয়ার বুক কোং, ১৮নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

'শ্রীকান্ত প্রথম পর্বের ভূমিকা' পাঠ করে' আমরা প্রচুর আনন্দ পেলাম। শ্রীযুত মাখনলাল একজন পণ্ডিত ব্যক্তি; তাঁর রচনা একাধারে সরল এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ মৌলিকতায় প্রোজ্জ্বল। শ্রীকান্ত সম্বন্ধে তিনি বহু নূতন কথা আমাদের শোনাতে পেরেছেন। বাঙ্‌লায় যাঁরা বি-এ বা এম-এ পড়েন—এ-বইখানি তাঁদের বিশেষ উপকারে আসবে।

গান্ধীজির জীবন-প্রভাত: শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য: আশুতোষ লাইব্রেরী, কলিকাতা।

অধ্যাপক শ্রীযুত বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের লেখা কিশোরপাঠ্য একখানি রসমধুর জীবনকাহিনী।

আর দ্বিতীয় ভাগ শুরু করেছেন।...আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস এই, একদা এমন দিন আসবে...খুব শীগ্‌গীরই আসবে—যখন বাঙ্‌লা ভাষার সাহায্যেই সকল বিষয়ে পাঠ নিতে হবে এবং দিতে হবে।'...সভাপতি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ এই সময়ে উল্লসিত হয়ে বলেছিলেন—'যাঁরা বাঙ্‌লা ভালো করে' বলতে জানেন না, আরশির সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বাঙ্‌লা-বলার চেষ্টা করুন। সাহস করুন। সাহস করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে!'

* * *

গত ২৯শে জুন সন্ধ্যায় মনীষী আশুতোষের জন্মোৎসব-পূজা সমারোহেই সংঘটিত হয়েছে। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুত সুধীরঞ্জন দাস মহোদয় পৌরোহিত্য করেন। পূজা দিবসে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ রোগে শয্যাশায়ী থাকায় 'মণ্ডপে' উপস্থিত থাকতে পারেন নি। তাঁর অনুপস্থিতি সভাস্থ সকলেই মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীকালীপদ তর্কাচার্যের 'মঙ্গলাচরণ' আবৃত্তি বিশেষ উপভোগ্য হয়েছিল।

* * *

'অধ্যাপক সঙ্ঘের' কার্যকরী সমিতি গত ১৩ই আগষ্ট, '৪৬ গঠিত হয়েছে। সাহিত্য বিভাগের জনপ্রিয় অধ্যাপক শ্রীযুত নীরদ ভট্টাচার্য এবং বিজ্ঞান বিভাগের রসায়নশাস্ত্রের প্রধানাধ্যাপক শ্রীযুত পঞ্চানন দে অধ্যাপক-সঙ্ঘের প্রতিনিধি হিসাবে 'পরিচালক সমিতি'তে যোগদান করেছেন। আমরা তাঁদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। অধ্যাপকবৃন্দের অভাব-অভিযোগ, সুখ-দুঃখ, গুণগরিমা সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থেকে যথোপযুক্ত কার্য দক্ষতার সঙ্গে তাঁরা সম্পাদন করতে পারবেন, এ-বিশ্বাস আমাদের আছে।

* * *

'অধ্যাপক সঙ্ঘের' সম্পাদক পূর্ব বৎসরের ন্যায় এ-বৎসরও শ্রীযুত শিবনাথ চক্রবর্তী নির্বাচিত হয়েছেন। সহঃ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুত অরুণপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়। আমরা তাঁদের আন্তরিক আনন্দাভিনন্দন জানাচ্ছি।

* * *

বাঙ্‌লাভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান হিসাবে বৃত হয়েছেন অধ্যাপক শ্রীযুত বিভাসচন্দ্র রায় চৌধুরী। অধ্যাপক রায় চৌধুরীর এই গৌরবে আমরা গৌরবিত। দক্ষতার গুণে তিনি অচিরেই পরিচালকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবেন বলে' আমাদের বিশ্বাস। অভিনন্দন গ্রহণ করুন তিনি।

* * *

প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুত বিভূতিভূষণ ঘোষাল মহোদয় কলেজের কোষাধ্যক্ষ (Bursar) নিযুক্ত হয়েছেন। অধ্যাপনাকার্যের ন্যায় কলেজের অফিস-বিষয়ক কার্যেও তিনি গভীর যোগ্যতা প্রদর্শন করতে পারবেন বলে' আমরা বিশ্বাস করি।

* * *

আমাদের কলেজের 'নৈশ বিভাগের' পরিচালক (ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল) নিযুক্ত হয়েছেন অধ্যাপক শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ সেন। অধ্যাপক সেনের গুণগরিমা, পাণ্ডিত্য ও বক্তৃতাশক্তি আজ শুধু এই কলেজের সংকীর্ণ সাধনায়তনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই; সাধনার বিচিত্র বিভাগে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ এই বিদগ্ধ মানুষটিকে উপযুক্ত স্থানেই উন্নীত করা হয়েছে। আমরা 'পরিচালক সমিতির' কর্তৃপক্ষীয়দের সুবিচারের জন্য গভীর আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

* * *

'অধ্যাপক সঙ্ঘ' আমাদের দুইজন প্রবীণ সহকর্মী—শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর এবং যতীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়-দ্বয়ের—মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে। অধ্যাপক পূর্ণচন্দ্র বাঙ্‌লা ও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অনন্যসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। অধ্যাপক যতীন্দ্রনাথ ইংরেজি-সাহিত্য অধ্যাপনে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁদের শোকার্ত পরিবারবর্গকে গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি।

* * *

'অধ্যাপক ক্লাব'-এর চা-চক্রের সম্পাদক আছেন অধ্যাপক শ্রীযুত পরেশ সেন। তাঁর দৃষ্টি-সুধা প্রাপ্তির অভিলাষে পিপাসার্ত চাতকের ন্যায় এই অংশে আমরা বেদনার সুর সঞ্চয় করে' রাখতে চাইছি। তিনি জানেন,

ASUTOSH COLLEGE STUDENTS' UNION

DAY DEPARTMENT—1946

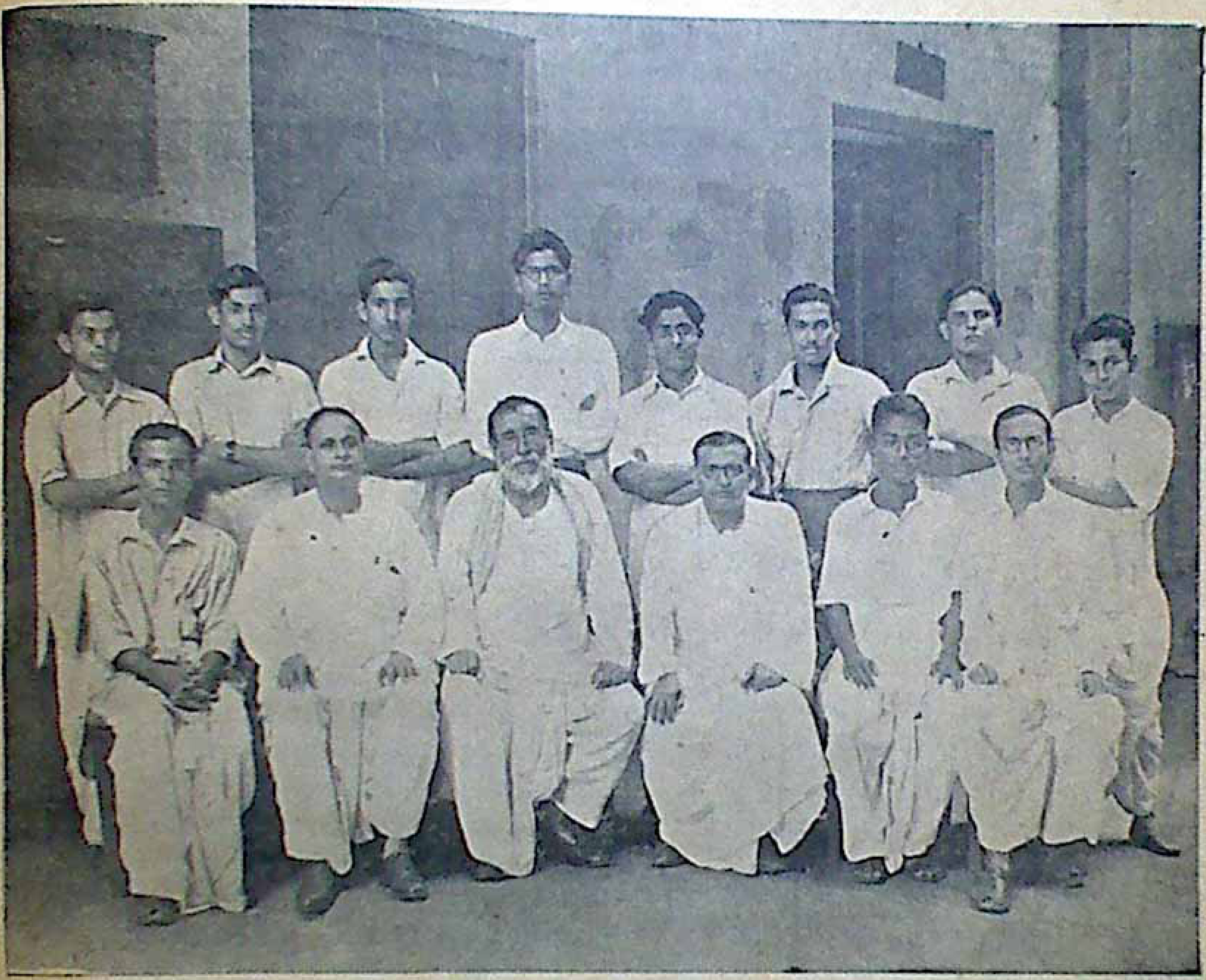

Sitting from Left :—Pratul Ray (General Secretary), Vice-Principal Someswar Mukherji, Principal Panchanan Sinha (Chancellor), Prof. Bibhuti Ghosal (President), Bhawani Choudhuri (Vice-President), Soumen Sen (Games' Secretary).

Standing from Left :—Soumen Gooptu (Poor-fund Secretary), Ratnajit Ghose, Santi Mukherji (Debating Secretary), Kumar Sankar Bose (Asstt. Games' Secretary), Parimal Ray, Amiya Chatterji, Debkumar Chatterji, Jyotish Ganguly (Asstt. General Secretary).

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাধ্যক্ষ শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় গ্রন্থখানির ভূমিকায় বলেছেন "ভারতের ভবিষ্যৎ জীবন প্রভাতে 'গান্ধীজির জীবন প্রভাত' চিরভাস্বর থাকিবে।" ভারতবর্ষের ভবিষ্য ইতিহাসে মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষাকালের কথা নিত্য নব প্রেরণা দান করবে—এ-কথা সকলেই স্বীকার করেন ;—কিন্তু যাঁরা সেই সমস্ত অমর কথাগুলি গল্পকথার মাধুর্যদানে শুধু সত্য নয়, গভীরতরভাবে সত্য করবার্থে সুন্দর করে' তোলেন, তাঁদের নাম কি 'চিরভাস্বর' থাকবে না? আমরা অধ্যাপক বিজনবিহারীর 'প্রভাত-রবির' মত 'জীবন প্রভাত' পাঠে গভীর আনন্দ অনুভব করেছি। শিশু ও কিশোর-সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর নাম স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। আরো নব নব 'প্রভাত'-কথা রচনা করে' তিনি শিশু ও কিশোর জগৎ-কে আলোকিত করুন—এই কামনা।

Higher Grade Bengali Essays for College Students: Prof B. Chowdhuri, M. A.: B. Sarker & Co., 15, College Sq., Calcutta.

অধ্যাপক শ্রীবিভূতি চৌধুরী, এম-এ মহোদয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র এবং কলিকাতা সিটি কলেজের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক। তাঁর 'কলেজের বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর জন্য রচিত উচ্চতর বাঙ্‌লা প্রবন্ধমালা' ছাত্রছাত্রীদের খুবই কাজে আসবে বলে' আমাদের বিশ্বাস। "গ্রন্থখানিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার্থীর বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রবন্ধগুলির আলোচনা করা হয়েছে।"........কয়েকটি প্রবন্ধ, যেমন 'সাহিত্যের প্রকৃতি ও মূল্য বিচার', 'গণতন্ত্র ও এক-নায়কতন্ত্র', 'ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনা', 'মহাকাব্য', 'ছাত্রজীবনের স্মৃতিকথা'—বেশ উচ্চাঙ্গের রচনা। পরীক্ষার্থিগণ তো এই সকল রচনা পাঠে উপকৃত হবেন-ই, সাহিত্য-রসিকরাও গতানুগতিক প্রবন্ধরচনার ক্ষেত্রে নূতনধারার রসাস্বাদনে সরস পরিতৃপ্তি লাভ করবেন। গ্রন্থখানির বহুলপ্রচার বাঞ্ছনীয়।

নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা: (পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ) শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী: দি বুক এম্পরিয়ম লিমিটেড, ২২।১ কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নাট্য-সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ, রূপ ও উপাদান সম্পর্কিত সার্থক একখানি সমালোচন গ্রন্থ। গল্প, কবিতা এবং উপন্যাস সম্পর্কে একাধিক ভালো সমালোচন-গ্রন্থ বাঙ্‌লাভাষায় আছে কিন্তু নাট্য-রচনার বিচিত্র রীতি, নীতি ও রূপকল্পনা বিষয়ে বাঙ্‌লাভাষায় কোনো ভালো সমালোচন-গ্রন্থ আছে বলে' আমাদের জানা নেই। এদিক দিয়ে বিচার করলে 'নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা' প্রণেতা শ্রীযুত বিভাসবাবু-কে বাঙ্‌লার নাট্য-সাহিত্য সমালোচকদের অগ্রণী বলা চলে। যাঁরা বাঙ্‌লা, সংস্কৃত বা ইংরেজি নাটক পড়েন বা পড়ান—তাঁদের পক্ষে বিভাসবাবুর এই 'ভূমিকা' একান্তভাবেই অপরিহার্য। গ্রন্থকার বাঙ্‌লাদেশের নাট্য বিষয়ের গবেষকদের কাছ থেকে গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

এল ঝড়: শ্রীননীগোপাল আইচ: লোটাস আর্ট প্রিন্টার্স; বেহালা, ২৪ পরগণা।

কবি ননীগোপাল আইচ বিরচিত কতকগুলি গীতি-কবিতার সমষ্টি। ননীবাবু একজন গোপন সাধক। প্রকাশের জগতে তিনি নবাগত হলেও বাণী-বিধাতার সুর-মন্দিরে বহুকাল ধরেই তিনি গতায়াত করছেন। 'এল ঝড়ের' গীতিকবিতাগুলি নবীন কবির পরীক্ষা মাত্র নয়, কৌশলীকবির সাধনসিদ্ধির প্রসন্নতা, প্রত্যেক গীতিতেই প্রমূর্ত দেখেছি। কবিগুরুর 'গীতাঞ্জলির' প্রভাবে অত্যুজ্জ্বল এই গীতিগুলি সুরসংযোগে আনন্দ-স্বর্গ রচনা করবে বলে' আমাদের ধারণা হলো।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—কলেজ-পত্রিকার এ-সংখ্যাটি গত আগষ্ট মাসেই প্রকাশ করবার জন্যে আয়োজন চলছিলো এবং সে-উদ্দেশ্যে পত্রিকার প্রথম পাতায় 'আগষ্ট' মাস এর প্রকাশ-কাল ধরে মুদ্রিত হয়েছে। কিন্তু দেশব্যাপী বর্তমান বিপুল অশান্তি ও বহুবিধ দুর্নিবার বাধার ফলে এর প্রকাশে এত বিলম্ব ঘটলো। সেজন্যে আমরা দুঃখিত।

১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪৬ সম্পাদক-সঙ্ঘ।

"OUR UNION"

PRATUL RAY—*General Secretary*

If the Students' Union of this College be a ship, I am, in a sense, its pilot though for a temporary period of one year. Obviously, the responsibility that lies on my shoulders is too great to be borne by a humble person like myself. Fortunately for me I am to act in this College in collaboration with my colleagues in the Union Executive Committee. In fact we have to pursue the same 'team-spirit' as is visible in a perfectly manned ship. On the other hand, the assumption of office by this present Union in January '46 synchronized with the greatest crisis in human history, when the aftermath of the World War II reached its climax. Curiously enough, the aftermath was most keenly felt in our country, though India was not a direct theatre of the last Global War. This gloomy and appalling background naturally made our responsibility greater and more complex.

That we could and can carry on our duty against such innumerable odds is to a large extent due to the experience bequeathed to us by our predecessor Union. So I should not lose this opportunity to express regards and thanks to the last Union and especially to Prof. D. B. Sinha, Messrs. Ranen Bose and the late lamented Santi Haldar, before I proceed with the actual activities of our present Union.

The activities of the present Union may conveniently be dealt with under different heads.

To begin with the social activities, we must give the foremost place to the Saraswati Puja celebrations. This year the Saraswati Puja has been celebrated with due pomp, grandeur and solemnity. On that occasion, the special feature in our college was that the image of the Goddess was modelled by Mr. Durgapada Banerjee and Mr. Satyeswar Mukherjee, both of them students of our college. I must here convey my sincerest regards to Prof. Bibhuti Ghosal, Prof. Arundhati Sen and thanks to Messrs. Ranen Bose, Bhawani Chowdhury, Ratnajit Ghose, Amal Chakravarty, Santi Mukherjee, Asoke Ray, Kisalay Mukherjee, Sashi Sekhar Chakravarty (Commerce), Jyotsna Ghosh (General Secretary, Women's Department) and to the volunteer friends, of all the departments. In this connection a "Saraswata Sanmelan" was held under the auspices of the 'Bangla Sahitya Samiti' in conjunction with the Union. The renowned poet Sj. Narendra Dev presided over the function and Mr. Piyush Kanti Chatterjee, General Secretary of the Samiti, by his commendable efforts, made the Sanmelan a grand success. Amongst the other social functions, I must not forget to mention "Variety Performance" held at the Bijoli Cinema Hall, where different artists ably satisfied the varying tastes of the audience. It should be noted here that the performance in question would not have been a success but for the untiring efforts of Jyotish Ganguly, Keshab Chakravarti, Bibhuti Dev Sarma, Soumen Gupta, and Santosh Mukherjee (General Secretary, Commerce Department).

The political activities of the present Union should now be presented before you. The political activities of this college only form a part and parcel

ASUTOSH COLLEGE STUDENTS' UNION
COMMERCE DEPARTMENT—1946

(L to R,) Sitting :—Anil Bose (Asstt. Secretary), Santosh Mukherjee (General Secretary), Prof. Bibhuti Ghosal (President), Amal Roy (Games' Secretary).
Standing :—Naresh Ghose (Jt. Editor), Suha sh Roy (Jt. Editor), Rathin Mazumder (Asstt. Games' Secretary), Indrajit Mukherjee (Common Room Secretary).

incoming of the Bengali New Year was celebrated with due pomp and grandeur under the direct supervision of the said Samiti in collaboration with our Union. Eminent litterateur Sj. Manoj Basu presided over the function and a few eminent authors of the day helped to make the function a complete success. But, the activities of the other societies and seminars are not at all satisfactory.

On the other hand, I must request Messrs. Soumen Sen (Games Secretary), Jyotish Ganguly (Asstt. General-Secretary), Kumar Sankar Bose (Asstt. Games-Secretary), Keshab Chakravarty (Cultural Secretary), Bibhuti Dev Sarma (Common-Room Secretary), Soumen Gupta (Poor-Fund Secretary), Santi Mukherjee (Debating Secretary), Amal Chakravarty and others to discharge their duties fully to the satisfaction of the students. Here again I extend my cordial thanks and regards to Prof. Bibhuti Bhusan Ghosal (President) and Mr. Bhawaniprosad Chowdhury (Vice-President) and my sincerest love and admiration to all the representatives of the Union.

In conclusion, it is necessary to emphasize that the success of the Union depends on the willing co-operation of the students. The union cannot, for example, impose the ordinary rules of conduct upon the self-conscious students, everyone of whom is expected to be a voluntary soldier in India's struggle for freedom. Thus, to disobey the professors without any cause in an impertinent manner and to cause serious disturbances to them by loitering on the corridor when the classes are in full swing are not at all commendable for those who profess themselves to be fighters for an Independent India. I am here consciously violating the path of "so-called" etiquette and hope that my shameless confession of our own weakness shall not be ineffectual. Please, don't misunderstand me and excuse my plain and frank speaking !

THE St. JOHN AMBULANCE BRIGADE

No. 3 (Asutosh College) Ambulance Division

The Division started in 1933 and since that time it has been serving the public with a good record. At present the strength of the Division is 52 members, including 2 officers and 4 N.C.O.'s. Recently, the demand for public duties has increased to a great extent and the necessity for increasing the strength of the Division is keenly felt.

The present committee of this Division consists of Principal P. Sinha as President, Mr. P. C. Banerjee as Superintendent, Dr. G. P. Mukherjee as Surgeon and Mr. S. P. Bose as Ambulance Officer.

SALIL KUMAR CHAKRABARTY
Secretary.

---

of the Indian struggle for freedom from foreign fetters. When we assumed office, dark and ominous clouds were gathering in the political horizon of our country. But the gloomy atmosphere could not depress the Indian National Congress and, to the contrary, this year witnessed the greatest and most acute struggle for Indian Independence. And, our college could not and cannot remain indifferent to the clarion call of our national organisation. The story of the Azad Hind Government and the exploits of the Azad Hind Fouj roused our college as never before. Thus, when in the month of February, the November firing at Dhurmatola was repeated, we raised our powerful voice of protest against the deliberate firing of the Calcutta Police and the Armed Forces on the un-armed students and public. Again, we held several meetings to demand the unconditional release of the officers and men of the Azad Hind Fouj and all political prisoners who are still rotting behind the prison bars. Moreover, to show our deepest love, respect and admiration for Netaji and his followers, we arranged for receptions to Captain Mansukh-Lal-Sardari-Jang of the Azad Hind Fouj and Mr. Uttamchand. Lastly, we also observed the glorious Royal Indian Navy Day, Seraj Day, 23rd January, 26th January, etc. etc. Here I must express my deepest regards for Prof. Nirode Kumar Bhattacharjee, Prof. Amulyadhan Mukherjee, Prof. Amiyaratan Mukherjee, Prof. Promothes Ray, Messrs. Rebatiranjan Sinha, Bhawani Chowdhury, Pritish Chanda, Manindra Chatterjee and others.

Our athletic activities, again, deserve special attention. Thus, to illustrate our achievements in Cricket Games, it is sufficient to mention the names of Messrs. P. B. Dutt and Arun Das. They represented the Calcutta University Cricket team and became the University Blue. Moreover. Mr. P. B. Dutt showed his best on many occasions and represented in the All-India XI (University) and in the East zone team against the Australians. On the other hand, in the Annual Inter-Collegiate Sports, Messrs. Nahar Singh and Sunil Mukherjee gave a good account of themselves. Again the Annual Sports Competition of our college was held on the University ground in due mirth and merriment. Mr. P. N. Banerjee, Vice-Chancellor, Calcutta University, presided over the function and Mrs. Banerjee distributed the prizes. Mr. A. Sinha distinguished himself as the best sportsman. But, as usual, our Hockey team was not up to the mark, though a few of our players were regular members in some first division teams. Amongst them, Mr. Nahar Singh deserves special mention. He received the University Blue and represented the Calcutta University Hockey team. But my accounts of our sports activities would remain unfinished if I forget to show my deepest regards for Prof. Promothes Ray and Prof. Paresh Sen for their untiring efforts to keep in tact the athletic morale of this College. Further, I convey my sincerest love and thanks to Messrs. Soumen Sen, Kumar Sankar Bose, Parimal Ray and my volunteer friends.

Lastly, I must not fail to survey the activities of the different Seminars and Societies in this College. It is gratifying to note that 'Bangla Sahitya Samiti' has done much good work to foster the literary leanings of the students. Thus the

THE CIVILISATION OF BABYLONIA AND ASSYRIA

S. B.

Mesopotamia has been just like Egypt the cradle of one of the mightiest of civilisations of ancient times. That tract of land which is enclosed between the two great rivers of western Asia, the Tigres and the Euphrates can be broadly divided into two parts—the Northern, which is more or less mountainous and the Southern, which is flat and marshy. Babylonia was situated in the south and Assyria in the north. Babylonia became the centre of an extensive empire long before Assyria, but the two great empires which grew up on the banks of the two great rivers can be separated as little historically as geographically. From the beginning their history, political and cultural, is closely intertwined; and the power and greatness of the one is the measure of weakness and decline of the other. Thousands of years before the birth of Christ Babylonia and Assyria had become the home of diverse peoples like the Sumerians of the yellow race akin to the Chinese, the cushites of deep brown complexion related to the Egyptians and the semites of the white race of the same stock as the Arabs. Together, these had built up a composite type of civilsation —the civilisation of Babylonia and Assyria. Before Babylon was first conquered by the Assyrians in 1270 B. C.—this civilisation had taken a concrete shape, it was uptill that time practically purely Babylonian in character, but then came the embellishments of the Imperial Assyrians to it which left a deep impression upon it, renotating it and vitalising it in no uncertain manner. This civilisation had thus become one indivisible whole, the component parts of which were practically inseparable by the time the mighty Assyrian Empire had been overthrown by the Babylonians in alliance with the Medes in 625 B. C. to recreate another empire of their own which finally was put an end to by the Persians in 538 B.C. Very little positively was known about the Assyrians and the Babylonians till the beginning of the 19th century. That there had been a great past in the land between the two rivers was known through all time, partly from the echoes of old stories and legends handed down from generation to generation, partly from the accounts of the kings of the country who were closely connected with the history of the Jewish nation and partly from the writings of old authors like Herodotus and Diodorus Seculus. The veil of the mists of time were lifted during the last century by the excavations and laborious researches carried on by such eminent scholars as Botta, Layard, DeSerzec Grotefend, Rawlinson, Oppert, Haynes and Smith.

My aim here will be to present a very brief survey of this remarkable civilisation as it was at the time when Babylonia and Assyria finally passed under the yoke of the Persians, some two thousand five hundred years before our own time. Shortness of space at my disposal forces me to refer to only the salient points, giving up all attempts to refer to the entrancing story of the gradual development of this civilisation through countless centuries.

The first thing that attracts our admiration in our study of the history of Babylonia and Assyria lies in the realisation of the peoples of this part—how important "writing" is for mankind as it preserves knowledge for posterity and enables it to

STUDENTS' UNION (Girls' Section)

JYOTSNA GHOSE—*General Secretary*

The present Students' Union of the girls' section of our college came into being on the month of January 1946 with Prof. Arundhati Sen as the president; since then it has been showing its noticing energy and spirit in manifold activities.

It was a month of political restlessness and we plunged into it whole-heartedly. Our first task was to celebrate Netaji's Birthday in a fitting manner. The celebration begun with the hoisting of the National Flag. A meeting was held at the foot of that banner of freedom and we stood to pay our silent homage for Netaji. A procession was then led to Netaji's house to attend a meeting presided over by one of our greatest national hero, Maj.Gen. Shah Nawaj. Independence Day was again observed on 26th January strictly in accordance to the Congress programme. A meeting against the unjustifiable sentence passed on Captain Rashid Ali of the I. N. A. was held and a resolution was passed unanimously condemning the high-handedness of the British Military Administration. We also observed a day for Sj. Jogesh Chatterjee, the great national socialist leader, who was by then fasting in jail.

I must also tell something about our social activities. We had arranged a farewell-party for the outgoing students of the fourth and the second year classes. Sj. Someswar Mukherjee, Vice-Principal of the Boys' Section, presided over the function. Farewell Address was given on behalf of the Students' Union. Vocal and instrumental music, dance, recitations, musical games etc. were the chief attraction.

Our next grand success was a steamer excursion to the Sibpur Botanical Garden held on 8th March. I extend our cordial thanks to Mr. Kalidas Sen, our Vice-Principal, Prof. Arundhati Sen and all other staff who participated in the excursion and helped us to make it enjoyable.

Let me say a few words about our athletic activities. Our Annual Sports ended with grand success. Mrs. Tara Mukherjee kindly presided over the function. The Tug-of-War between the first, second and the third year class was highly appreciated by the spectators. The third year class came out as the winner of the pleasant challenge. Cheer up for the winners! Our College participated also in the Inter-Collegiate Sports and made a satisfactory result.

This year our Union celebrated the Saraswati Puja in co-operation with the Boys' Union amidst great festivity and success. I thank those who volunteered their services on the occasion.

Last, not least, I must express my sincere thanks for Maya Banerjee, Arati Gupta, Sabitri Sen, and Uma Basu Roy, the Jt. Asstt. Secretaries, Sanjukta Kar and Seemanti Chakrabarty, joint Magazine-Editors, Daliya Datta, Sahana Mitra and others without whose untiring zeal and enthusiasm the success of all the functions arranged by the Union would be impossible.

of Mediaeval Europe and these charters certainly imposed serious limitations upon the tyranny of the kings. The city administration was in the hands of regularly constituted boards which were aristocratic in character and their economic life just as in the case of Greek city states was broadbased on slave labour.

The possession of an empire forced the people of Assyria particularly to think of a policy which might enable them to hold it on. Her "imperialism" based on the transferrance of a whole people from one country to another had its prototype in the continent of Europe when the Nazis were triumphand at the beginning of World War II.

The modern world with its thirst for knowledge must be deeply beholden to the Babylonians and the Assyrians for setting an example of what a well-equipped and a well-manged library ought to be like. Ashurbanipal's great library where books were intelligently arranged and properly catalogued is the finest and the earliest great library which the world has ever had serving as a model on which subsequent libraries could be built up.

A study of the Art, Architecture and Sculpture of Babylonia and Assyria will also strengthen our respect for this civilisation. So far as architecture is concerned we cannot get any clear idea of that, prior to the rise of the Assyrian empire due to the ravages of Nature and still more pitiless ravages of Men. But here, as in everything else, the Assyrian built on a Babylonian foundation, so that it is not difficult to form a judgment of it at the same time of the two countries. The Babylonian and the Assyrian Architectural works were mainly executed with crude Semdried bricks the Assyrian facing the exterior of the wall with stone. In both the places, the temples were pyramidal—of stories or terraces similar to the tower of Borsippa of the 7th century B.C., and palaces were constructed on artificial mounds or raised brick platforms making them low and flat. The crude brick was not well adapted to high arches. Halls therefore were strait and low but they were very long. These palaces resembled a succession of galleries—the roofs were flat terraces provided with battlements. At the gates stood gigantic winged bulls with human heads. Within, the walls were covered with panelling either with precious woods, or with enamelled bricks or with plates of sculptural alabaster. Sometimes the chambers were painted. "Columns" were in use in the Assyrian palaces. Only in the case of underground drains—a rather familiar feature in the buildings of Babylonia and Assyria "arches" were utilised. The Persians showed to what extent they had been influenced by the Babylonian and the Assyrian architecture in their palaces at Susa which excited the admiration of the Greeks later on. The world-famous hanging-gardens of Babylonia speaking of a rare aesthetic sense formed a noticeable feature of the palaces of Nebuchadnezzar during the sixth century B. C.

In the field of sculpture, a comparison and contrast between De Serzac's find at Lagash of one statue of a priest belonging to the early Sumerian period (about 3000 B. C.) and fragment of another statue belonging to 2400 B. C. and a statuette of Ashurnasirpal and a lion from the doorway of the same king, both of 9th century B.C. which we get in the British Museum help

grow through the process of time. Long before the Egyptians started writing on the Papyrus, which is the nearest approach to the writing on paper, the people of Babylonia and Assyria had started writing on clay bricks or clay cylinders which after being written on, were hardened and kept. "Writing" had become familiar here even before the time of the Great Egyptian civilisation. This "writing" was in "cuneiform character" i.e. "wedge-shaped" letters and in this form it was borrowed by the neighbouring states and peoples.

Secondly, here perhaps for the first time in human history the study of "Astronomy" began in right earnest. According to Seignobos "From this land have come down to us the Zodiac the week of seven days in honour of the seven planets ; the division of the year into twelve months, of the day into 24 hours, of the hour into 60 minutes and of the minute into 60 seconds. This civilisation would have claimed our undying gratitude if it had given nothing else to us.

Here again originated as Seignobos points out that system of weights and measures reckoned on the unit of length —a system adopted by all ancient peoples. The scientific bent of mind of the people of Babylonia and Assyria is again undeniably demonstrated in their attempt at the development of "Astrology". Here in the land of the two rivers, thousands of years before the birth of Christ men strove seriously perhaps again for the first time in their history to peer into the future. It has not been proved that their beliefs that what occurs in the skies is indicative of what will come to pass on earth, and that every man comes into the world under the influence of a planet which moulds his destiny, were erroreous. Hindu "Astrologers" have been much influenced by their studies in Astrology.

Again the modern world cannot withhold also its tribute of admiration to the people of these empires for their early appreciation of the necessity of having "codified laws" enabling the citizens to understand their "rights" and "obligations" within the state. The idea of "bloodfeud" had been abandoned long before the publication of the code of king Hammurabi compiled some two thousand years before the time of Christ. The code of Hammurabi is of special value to a modern Jurist interested in the history of the development of Law as it enjoys perhaps even now the distinction of being the earliest code of laws in existence. It also furnishes important informations regarding the social and economic life of the people within the borders of the Babylonian empire during that time. Simultaneouly, to help the people to pick up an acquaintance with the "laws of the Language" these astonishingly intelligent people prepared an elaborate "Dictionary" and wrote grammars as are done in our days.

Another very interesting feature of this civilisation lay in what Olmstead describes as the "Imperial Free Cities". According to him the dictum that "Political freedom appears first with Greek city states is without any foundation for in many respects the typical Greek city state was only a small and late approximation to the mighty cities within the borders of the Babylonian and Assyrian empires. The rights and privileges of these cities were based on royal charters as in the city states

NATURE AND ART

MANI CHATTERJEE—Second Year Science

"Art is the child of Nature ; yes,
Her darling child, in whom we trace
The feature of the mother's face,
Her aspect and her attitude"………so says Longfellow ; and we all know what Art owes to Nature. To say that all great Art is based on Nature is to utter a commonplace, the truth of which will not be disputed by any person who has thoughtfully followed the sequence of art history throughout the ages. Nature is the in exhaustible treasury whence the artist and the inventor derive their highest inspiration and there is nothing in the world, from picture to a flying-machine, that does not owe its origin, more or less directly, to something observed in natural form.

In a way we all know this to be true, and yet most of us would hesitate to proceed to the logical conclusion and assert, for example, that every shape and thing fashioned by the mind of man has its prototype in the creations of Nature. Does not Art, it may be argued, show us figments of the imagination, things like Centaur, that have never had any real existence ? But the Centaur was only the result of muddled observation, the notion of a poetically-minded pedestrian about the rider of an animal unknown to him.

What we find in Art, is in reality only a refined form of Nature's beauty. Poets, artists and men like them look at Nature with a view to find out a new world, comprising all form of past styles, from dramatic tension to austere repose. They experience a lyrical inspiration in hearts and then give vent to their sur-charged emotions in form of word or picture.

I know lots of artists, desperately searching about for new sources of inspiration, to the nd that they may achieve some element of novelty in their productions. They have turned their eyes on the art of the past, seeking for some stimulus from the art of the Ajanta cave, from the sculpture of Konarach temple, even from the wood-carvings of the savage Dravadians ; and very little good has come from their ransacking of the ages and searchings into the art of the past. All their efforts end in smoke. Not by any greater knowledge of Art, but a greater knowledge of Nature does Art truly progress.

Keen power of observation and accuracy in expression are the two most important faculties that an artist needs much. The great artists of the Renaissance were not only superb draughtsmen, but were also, most of them, keen observers and ardent students of Nature. All the world knows that Leonardo-da-Vinci was scientist as well as artist, as great a Botanist and Geologist as he was painter and sculptor.

'All nature is but art, unknown to thee'……so said Pope, but the converse is almost equally true. All art is but an ingenious paraphrase of Nature. Even the beauty of such seemingly abstract geometrical designs as we find in a Persian carpet can be traced back—if we push our research far enough—to a suggestion derived from the shape or structure of some from in Nature.

Thus it may be said that Art and Nature are inextricably linked. The more we know about Nature the wider is our experience to unlock the secret door of Art.

us to form some opinion regarding development through the process of time. On the whole, the statues are coarse and cannot stand any comparison with that of the Greeks of the 4th century B.C. But the Basreliefs in which the Assyrians excelled, some of which have been miraculously preserved are indeed a possession for ever. They represent complicated scenes of battle, chases, sieges of towers, social ceremonies etc. In them every detail is scrupulously done. Though persons are all exhibited in the profile—the artists undoubtedly experiencing difficulty in depicting their face, they possess dignity and life. The Greek reliefs which are almost perfect trace their origin to this school and so their debt to this civilisation is undoubted. In their faithful representation of the animals, the Assyrians have not been surpassed even by the Greeks.

The "art of pottery"—world's oldest art, the "art of dying", the art of "tanning", the art of manufacturing of woolens and fine linen all reached quite a high standard of excellence. According to Olmstead "Babylonia was perhaps the home of the potter's wheel". Glazed pottery of Assyria and Babylonia is quite admirable though it cannot stand any comparison with the pottery of Greece.

A female statue in bronze with close fitting clothes draped over her left shoulder and an eloborate mass of hair looped from her crown of neck, belonging to the archaic period, fragments of bronze work on Ashurnasirpal's palace door and lion weights of the days of Sargon all go to prove to what extent "working on Metal" had become a finished art here. Work on precious metals like gold and silver though familiar—there are irrefutable proofs of that, has not survived the numerous and savage plunders, mass-acres and burnings to which the cities of the Euphrates valley had been subjected. Similarly the world knows nothing about their master-pieces in painting.

Letters—commercial and private, codes of law, chronicles of campaigns of the kings, the so-called 'Creation tablets" and the first fairy story in the world—the adventures of Gilgamish all make it possible to form some opinion of their ancient literature. It seems to be surprisingly varied and progressive. Its contribution towards the development of history which is accurate both regarding chronology and narration of facts is gratefully acknowledged by all.

Finally, it may be of interest to know of the great interest of these ancient peoples in Music. The harp was of course the usual instrument on which they used to play. But later on the Assyrians started playing on "Dulcimars" in which the strings were struck by hammers. This was the first instrument on which music was made by striking strings with a hammer and it is well-known that it is how the Modern Piano is played.

The study of the civilisation of a people remains incomplete, if no reference is made in it of manners, custom, religion or Economic life of that people. But that is impossible within the short compass of an article of this character. What has been said however, I am sure, will convince all, about the intelligence of these ancient peoples who worked in their own way to enrich the world's fund of truth, beauty and culture some two thousand five hundred to five thousand years before our time.

the poison-fangs of Fascism are still lurking ready to thrust their death-sting into the throat of democracy.

The history of South Africa's past relation with India constitutes an epitome of unsavoury scandal. As we run our eyes over the pages of such a history, we have to pass through diversities of passions whose intensity would almost overmaster us. We have to 'digest the venom of our spleen' as we present before our mind's eye, the picture of Mahatma Gandhi silently leaving the arena of the Durban Court, his only disqualification being that he had his own national costume on; we have to clinch our fist and spring to our feet, as we see with our mind's 'inward eye', the tragic spectacle of the same half-naked, seditious '*fakir*' submitting meekly to the volleys of blows that were raining on him; we have to press our lips and grind our teeth as we revive in our memory, the circumstances that led to his quarantine in a ship off the shores of South Africa.

This embitterment of India's relationship with South Africa dates back to the year 1860 when the Europeans there, by an agreement with the Government of India, secured the immigration of Indians into South Africa for the furtherance of their own economic interest. The coolies, as all Indians there are generally called, outlived the period of five years which was their allotted span of residence in that stark cesspool of racialism. They made rapid strides in the line of agriculture and permanently settled down without any intention of coming back to India. This progress of the Indians opened the sluice-gate of jealousy in the hearts of the Europeans. They now resolved to smoke out those helpless hordes of locusts. Then followed an orgy of legislative repression. The Indians were completely deprived of their parliamentary franchise in 1896. They are not allowed co-education with the Europeans. They cannot hold high offices. They are not within their rights to travel in the same compartment with the Europeans. This long catalogue of restrictions has made their life a burden to them.

The Asiatic Land Tenure and Indian Representation Act is but the culmination of that rising crescendo of racial hatred. So far as the provisions of the act are concerned, all land in Natal and Transvaal will be divided into restricted and exempted areas. In the exempted areas, Indians will be free to purchase and occupy land. In all other parts of these provinces, it will be necessary for Indians to apply for special permits—permits which, it may be assumed, will not be granted. The Indians will be represented in the Senate by two Europeans, one of whom will be elected by Transvaal and Natal Indians and the other, nominated by the Governor-General. In the assembly, the Indians will be represented by three Europeans. For this purpose, Natal and Transvaal will be divided into three electoral areas. The African whites look upon the representation of Indians by Indians in Natal, as the thin end of the wedge of Indian infiltration into the political sphere.

This is, in a nut-shell, the provisions of the much-talked act—the act which has brought into prominent relief, the racial arrogance of God's chosen sons, who, by virtue of the white pigment of their skin, think of the Indians as belonging to a race

KAMRUP HILLS

Vasistha-Asram, May, 1946.

"A Land where it is always afternoon"—
TENNYSON

A. K. R.

A cloudless sky, a dazzling glow
Of Sunshine in the height
Low winds that lift the dust and blow
Along the roadways white—
Thus Summer's Matron grace appears
In stillness, Warmth and Light;
And over all, a purple-haze—
The drowsy Noon's bequest.
How deep the sense of Peace and Ease
Such quiet scenes suggest!

O' slumb'rous woods and waters slow
That through your mazes creep,
O' winds that do but idly blow
As from the Isles of Sleep,
We turn from ye to reach the hills—
God's secrets they keep!

What glorious visions half-exprest
Their solitudes they enforld!
What hidden force their crags attest!
What treasures do they hold
Of ferns and flow'rs and water-springs
And creature-life untold!

Unscathed they lift their mighty heads
When angry tempests blow;
On them the coming winter sheds
His earliest gifts of snow;
They greet the smile of sunrise too
Ere we its light may know.

They stand unmoved thro' years of change;
Our labour or our skill
May form the land in features strange,
And bend the streams at will;
The strength of the hills is His alone
Whose words do they fulfill.

INDIANS IN SOUTH AFRICA

HARI ANANDA BARARI—Second Year Arts

The Asiatic Land Tenure and Indian Representation Act which has recently been passed by the South African Government is not the first of its kind. It is only one link in the long chain of sinister legislations meant to outrage the 'fundamental human rights' of the Indians in that country. They have been driving on the Juggernaut of repression and under its ponderous wheels the Indians there are being most inhumanly ground down. India has done well by cutting off commercial and diplomatic contact with a people who do not hesitate to flash the weal of dishonour across the fair face of her.

The fall of Hitlerite Germany has not tolled the death-knell of Fascism. The persecution of the negroes by the whites in America—the so-called nursery-ground of democracy is proof of the fact that fascism still survives. The avalanche of violence that has been set rolling in South Africa beats hollow the cruelty and bestiality associated with the anti-Jewish programs of Germany. The tentacles of the fascist Octopus are still out-stretched;

TO IMMORTALITY

ARUNKUMAR DATTA GUPTA—Fourth Year Arts

Two gods one stormy night,
At the top of Heaven's tower seated,
Talked about the woes of humankind.
A strained silence of all living things,
Saw the winds all about in fury ;
No spark unveiled the face of wizard night.
All at once the twin's eyes were drawn
Far, far away on the lifeless wilds,
'Cross winds and rain and hails and darkness dead,
To lights flic'ring in one finest line—
Slow and steady, moving e'er to the East.

What was it ? the gods trembled in fear ;
Witches' lights, or hellish devil's torches ?—
Friends or foes ?—In alarm they shriek'd aloud.
But the Voice of God upheld their will ;
This they heard in great relief : "This march
Of lights is march of humankind for Life.
Thro' ills and fears, night and storm and woe,
Towards eternal Weal, Light and Song,—
The land which lies past your Heaven's bounds—
There to exchange Death for immortal Life."

THE MAKING OF A BUSINESSMAN

Prof. SIVA PRASAD MUKHERJEE, M.A. (Econ.), M.A. (Com.)

Successful business-magnets are very fond of reminding us how they began their business-careers without any capital and business-training, and how they, against heavy odds, subsequently became successful through sheer dint of labour, perseverance, temperance and all that. Nobody denies that manly virtues are essential for success in business. The lives of Andrew Carnegie, Lord Nufield, Sir Rajendra Nath Mukherjee and others also tell the same story. But business-magnets of this calibre are born and not made. Hence their biographies—though they may offer good, moral advice—are more likely to mislead than to direct the young business-enthusiasts.

Those dark days, when business was looked upon as a "disordered sphere for the untrained and the unclaimed", have passed. Modern business is really "a profession often requiring for its practice quite as much knowledge, and quite as much skill, as law and medicine."

Business is an open career for all. The question thus naturally arises : On what does the success of a businessman depend ?

It is an open truth that the succes in a business-concern primarily depends upon three factors—(i) the man, or the personal factor ; (ii) capital, or the financial factor ; and (iii) organisation, or the methodical factor. A young aspirant for success in business should, therefore, give his careful consideration to each of them, so that he can do the best for himself.

The first and foremost factor indispensable in the making of a successful businessman is the personal factor. The efficiency and successful working of a business is a matter of personal equation, and the greater is the personal ability of a businessman, the

of sub-humans. Is this the abolition of the Pegging Act of which F. M. Smuts talked, as all swashbucklers do, in the inspired words of a prophet, during those grimdays of the global war when Indians were vitally necessary to prop up the careened ship of the State of South Africa? Or is it simply the extension of its scope of operation from Durban to the whole of Natal and Transvaal?

F. M. Smuts is known to have had a hand in framing the charter of United Nations which begins with the following platitude :—"We, the peoples of the United Nations, determined to save the succeeding generations from the scourge of war which twice in our life-time has brought untold sorrow to mankind and to re-affirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of Nations, large and small, ..." The high-priest of 'fundamental human rights' has trampled upon the very letter and spirit of the charter of United Nations. Is it not smack of hyprocrisy on the part of our F. M. Smuts?

What should be our decision when we find our national honour trampled upon by the Jack-boots of the South African whites? They dare to heap this insult on us because they know that India is a submerged nation groaning under the yoke of foreign domination. They are not aware that India today is ebullient with the excess of youthful vitality—that she is a bubbling volcano of revolutionary energy with its smoking crater always wide agape, ready to vomit forth molten lava. It is by unqualified and unequivocal declaration of war that we can make our weight felt in the world. The memorandum to the Viceroy submitted by the Indian Delegation from South Africa led by His Highness the Aga Khan, runs thus: "There are many historical precedents that when the members of a race have gone and settled in another country and are subjected to unfair treatment, the mother-country has supported its nationals even to the extent of going to war". The best examples are furnished by the Boer War and the Italian War against Austria in 1915.

Mrs. Pandits scathing condemnation of racialism at the U. N. O. General Assembly has perhaps awakened the nations of the world to a realisation of the grave injustice, now being perpetrated upon the helpless Indians in South Africa. F. M. Smuts has, of course, objected to a debate on the issue, on the ground that, by doing so, the U. N. O. would be poking its nose into his domestic affairs. He took shelter behind the protective walls of the same specious plea at the Imperial Conference of 1923. We most emphatically repudiate his preposterous plea; the issue, at hand, has a broad significance; it symbolises the struggle between two sections of humanity—the blacks and the whites. It is heartening that the Steering Committee of the U. N. O. has approved of the United States proposal for a debate on this issue in the General Assembly. Let the U. N. O. prove that it is not doomed to frustration that it is not going to meet the same fate as—its predecessor—the League of Nations. On it is fixed the gaze of the world's oppressed millions. Let it prove to be a banner and beacon of hope to mankind; let it act as a sort of greenhouse by helping the growth of democracy under the shade of its protection.

One admits that nothing can be done without sinews of war. But of itself it can do nothing. It is like a labourer's spade. Hence in the words of Prof. Ashley, side by side with capital, "a systematic business-training would certainly raise the general level of efficiency in the ordinary management of commercial affairs, and, though it cannot creat geniuses, it may direct into the paths of commercial life a great deal of ability of a higher order which at present goes to waste. And while no curriculum can possibly be devised which will enable the commercial graduate to step at once into a position of leadership and authority, much can be done to enable the young man of business to profit by his early experience more rapidly and less painfully than is commonly the case."

It is a pity that our young men of education after the completion of their academic careers expend all their energies in securing sundry jobs with insufficient emoluments, while the vast field of business and commerce is lying unexplored. This is the time when they should gird up their loins and 'strike the iron hard while it is red.'

WALK ALONE

LALIT SEN—Fourth Year Arts

If none respond to your call
then walk alone, walk alone,
O wretched, walk alone.
If they do not speak,
If they turn their backs and do not care
Then open your heart
and speak your heart out alone,
Speak alone, speak alone
O wretched, speak alone.
If they recoil back,
If they stagger in risky journeys
and are afraid,
Then under the bleeding feet
you crush the thorns alone,
Crush alone, crush alone
O wretched, crush alone.
If none hold a light,
If they shut their doors in stormy nights
Then from the lightning
you light your ribs and burn alone,
Burn alone, burn alone,
O wretched, burn alone.

Sense taken from Tagore.

UNFINISHED

SUDHANGSHU SEKHAR MUKHERJEE—Ex-Student

I know, ah yes I know—the simple worship,
The tasks which I undertook nor could
perform
Throughout my life;—this is not vain, I know.

Many a little flower of sweetest promise
Has slowly faded long ere it could bloom
And spill its fragrance for the human mind;
And the clear stream of many a river
Has lost its way amid the desert-sand,
But still this coming here and their creation
Has not been fruitless,—this I surely know.

I know those things which now are lying dead
Beneath the boundless ocean of the past
Came not to me with sterile lack of purpose.

Those things which still lie far beyond
my reach
Those things which still are unattainable
by me.
Spring softly from your tuneful lyre, my Lord;
They will not come in vain,—this too I know.

From the original Bengali by Rabindranath.

greater is the likelihood of success in a business.

It is a mere truism when it is said that experience and expert knowledge are the most indispensable factors in the making of successful businessman. The young university graduate is prone to think that his scholastic attainment is a sufficient guarantee of his business ability. Such a notion is fantastic. It is no wonder, therefore, that the over-confident young university graduate finds him in a fix when he sits down to prepare business-letter for his prospective clientele. Of course it is not implied that academic training is irrelevant, but what is stressed upon is a systematic business-training and practical experience for a man before he can reasonably expect success in his business.

To create an atmosphere of trust and confidence the businessman must be hard-working, preserving, alert, punctual, thrifty and temperate. Besides, he must possess an experiencing nature, whereby he can perceive "the right moment and the right degree of force to use" in furthering his business-operations. Again he must be ready to learn from others.

It is not enough for a businessman to see that the business runs smoothly. The businessman must have the ability to visualise future opportunities and plan schemes to meet the antecedent requirements. Thus a businessman must look ahead if he wants to go ahead. This implies good judgment in a businessman.

"Good judgment is a quality of the mind which enables a person to form a just estimate about facts which he understands;" and it depends upon sound knowledge. A mere superficial knowledge in a businessman is likely to mislead him more than to aid him in furthering his business-objective.

Every successful businessman should be a blend, in due proportion, of caution and self-confidence. Over-confidence amounting to "reckless and criminal propensity to speculation and gambling" ruins men of great ability. On the contrary too much caution is another name for timidity. The shrewd businessman must safeguard himelf against excessive rashness on the one hand and excessive timidity on the other if he wants to come out in flying colours.

Some common weaknesses, such as injustice, jealousy etc. must be avoided. It can hardly be denied that with the businessman's increased respect for his staff, and recognition of ability displayed by his assistants, a healthy understanding likely to grow, which, by itself, is a great asset for the success of a businees-undertaking. A keen sense of responsibility is another prop which helps the businessman to stand erect.

In building up a successful business, capital is no less an important factor. It is an essential to successful engagement in business-ventures as personality is to run them. Hence the man who wants to embark on a business-venture should count his coins very carefully, and guess fully beforehand the amount of capital neccessary for his venture. The man with limited means should not venture to sponsor any business wich requires locking up of a large amount of capital in stocks, and which demands long-term credit to be given to its clients, since such a business for iis probable success is meant for a man of sufficient means.

Magadhan Empire that they resolutely opposed the great General when he insisted that they should cross the Ganges and encounter the forces of Magadha; and the Macidonian Monarch had to retreat. And, it is indeed significant to note that the Greeks, though they were unwilling to attack the Magadhan Empire even under the able leadership of Alexander, had little difficulty in carrying their victorious arms into the heart of Northern India, and disintegrating the Magadhan Empire a short time after the demise of Asoka. This fact automatically leads us to the conclusion that owing to the new policy inaugurated by Asoka after the Kalinga War for the promotion and propagation of Dhamma, everything had suddenly changed. But, India, in the 3rd century B. C., needed men like Chandragupta Maurya to ensure her safety against the Yavana menace. Instead, she got only a dreamer in the person of Asoka. Magadha, after the Kalinga War, slowly wasted her conquering zeal in trying to bring about a religious revolution; and thereby the martial ardour of Magadha was lost for ever. And, that was why the Magadhan Empire was shattered to pieces, immediately after the death of Asoka, primarily under the pressure of Yavana invasions.

Summing up, we find that Asoka's policy of spiritual conquest meant a complete reversal of the entire policy of Magadha for the preceding three centuries. The new policy of Asoka, as introduced after the Kalinga War, marked the beginning of the decay of the military and political power of Magadha. Asoka's policy, above all, constitued a death-blow to the only real attempt at Indian unification in those ancient days. Hence, Asoka, the greatest Monarch of Indian History, was also the greatest betrayer of the cause of Indian unification. He did not deliberately utilise the precious legacy that he inherited from his ancestors to realise the conception of a united India, and that was his unconscious betrayal to his own country.

CALCUTTA CARNAGE AND ASUTOSH COLLEGE

'PIKECY'

Thousands of people, both Hindus and Muslims, lost their life, their property and their shelter during last Calcutta riot. A relief-centre for giving aid to these men, women and children was opened in our college-building. The refugees, numbering over four thousand, were provided with shelter, food, clothes, diet and proper medicine in this centre.

Various social and political organisations, namely, 'Sri Gouriya Math', South Calcutta Congress Committee and 'Jatiya Mahila Samhati' came forward to render their best possible help to the refugees. Profs. Sukumar Bhattacharya, Promothes Roy and Mr. Rishipada Sircar of our institution rendered unique service in office-work.

The boarders of both the hostels of our college took the initiative of maintaining this centre under the captaincy of Messrs. Monoranjan Das and Provat Banerjee. The responsibilities shouldered by Messrs. Subhendubikas Purkayastha, Dulal Dev, Aparesh Nandi-Mazumdar, Rathin Palit,

ASOKA—THE BETRAYER !

BHOWANI PROSAD CHAUDHURI—Ex-Student

Paradoxical as it may seem, Asoka—the Greatest Sovereign of Indian Histoy, and one of the conspicuous names in the history of the world—was a deliberate, though unconscious, enemy to his own country. Why this was so may be seen by examining the main trend of Indian history during the preceding three centuries.

The history of India during the period in question was the history of the steady rise of Magadha and the absorption of the greater part of India within the Magadhan Empire ; and consequently this particular period of Indian history was characterised by a gradual and continuous attempt at Indian unification. The movement was set on foot by the Magadhan King, Bimbisara, about the middle of the 6th century B. C. By his territorial acquisitions, Bimbisara increased the boundaries of the Magadhan Kingdom. Thus he launched Magadha in that career of conquest and expansion which only ended when Asoka gave up his sword after the Kalinga War. Indeed, the policy of Bimbisara was honestly followed by his successors, Ajatasatru, Udayia, Sisunaga, Mahapadma Nanda, Chandragupta Maurya and such others ; and each of them materially contributed to the expansion and aggrandisement of the Magadhan Empire. Even Asoka, the grandson of Chandragupta, was a typical Magadhan Sovereign, at least for the first thirteen years of his reign. And, the final stage in the expansion of Magadha was reached at the time of Asoka, when he conquered and annexed the province of Kalinga. Magadha, under Asoka, reached the farthest limit of her expansion ; and the conclusion of the Kalinga War saw the Magadhan Empire comprising almost the whole of India excepting the southern extremity of the Deccan peninsula held by the Choda, Pandya, Keralaputra and Satiyaputra Kings. Thus the goal of a united India was not far off.

All this, however, came to an end just after the Kalinga War. The slaughter and suffering which attended the conquest of Kalinga completely changed Asoka's mind. And, the Kalinga War thus proved so be the turning-point in his career. Indeed, Asoka was induced to take refuge in the doctrine of Buddha. The effect of the change of religion was felt at once upon the whole policy of Asoka. Infact, the conquest of Kalinga marked the end of the era of military conquest, and the beginning of the era of spiritual conquest.

This changed policy no doubt resulted in the establishment of Buddhism as a world-religion. But, though the result of this new policy was spiritually glorious, it was politically disastrous for India.

Asoka's new policy served as a death-knell to the long-cherished dream of the India people for a united India. The effect of his pacific policy became manifest soon after his death. Immediately after the death of Asoka, dark clouds became distinctly visible in the North Western horizon. And, hardly a quarter of a century had elapsed since his death when the Bactrian Greeks crossed the Hindukush, and began to cause the decay of the Magadhan Empire. Here it may be recalled that even under Alexander the Greeks were so much afraid of the

Lord Wavell arrives to pay a visit to the Relief Centre. Sir Burrows, the Bengal Governor, is seen standing behind.

CALCUTTA CARNAGE AND THE ASUTOSH COLLEGE

Lord Wavell, before leaving the centre, shakes hand with Prof. S. Bhattacharya, Vice-Principal S. Mukherji standing between them.

A view of the Medical Ward of the Relief Centre.

Photo by Syamacharan Chakravarti, 3rd. Year Arts.

Doctors and Medical Volunteers attending to the wounded persons.

Kanti Chatterjee, Asutosh Mukherjee and Ajit Mukherjee were duly carried out.

A group of rescue-workers headed by Dr. Maitreyi Bose and consisting of Messrs. Piyush Sen Gupta, Piyush Guha, Niren Roy and others gave excellent service in times of rescuing the people from the affected areas at Calcutta.

In the medical ward quite a good number of wounded persons, receiving injuries from stabbing, gun-shot, brick-bats, etc., were attended to day and night by the doctors and volunteers. Messrs. Debaranjan Chanda and Anil Chatterjee, were in the charge of medical volunteers.

Our report will remain incomplete if we do not mention the names of the prominent workers like Mira Das Gupta, Anjali Mukherjee, Ratna Sen, Lakshmi Guha, Chhatrapati Sircar, Samir Das Gupta, Nani Chatterjee and Sisir Sen Gupta.

Lord Wavell, the present Viceroy, paid a flying visit to our relief-centre on 26th August last. He was accompained by the Governor of Bengal. The Viceroy inspected all the sections of our centre and spoke highly of its management. He was greeted with 'Jai Hind' by the volunteers at the gate.

Acharya Kripalani, the Congress President, Mrs. Sucheta Kripalani, his wife, Sj. Sarat Chandra Bose, the member of the Congress Working Committee, and Sj. Surendra Mohan Ghose, the President, B. P. C. C., also visited our relief-centre and gave us valuable suggestions.

The inhuman atrocity committed by both the communities is being deeply deplored and severely criticized by all. We are happy to note that several peace-committees are now being opened to encourage national sentiments all over the country.

ASUTOSH COLLEGE LIBRARY

P. C. BANERJEE—Librarian

In the Session 1945-46 Rupees 4915-14-0 were spent for the purchase of books and 877 volumes were added to the existing stock of 11,997 volumes.

Thirty periodicals, both Inland and Foreign, were subscribed and about Rs. 650/- were spent for the purpose.

During the Summer and Puja Vacations the 'Reading Room' of the Library was kept open from 8 A. M. to 10-30 P. M. for the Girl Students and from 4 P. M. to 8-30 P. M. for the boys.

In the Boys' Section about 3180 volumes were issued for home use and about 10,200 volumes were issued in the Reading Room. About 2050 volumes were issued to the students of the Day Department having special permission to read in the Library after evening. In the Commerce Department 1632 volumes were issued to the Boys for home use and 1814 volumes were issued in the Reading Room. The Professors borrowed about 2500 volumes from the Library.

A great demand for Text-books exists and this demand has been on the increase. In order to meet the requirements the Principal has been pleased to sanction a block grant of Rs. 8000/- for the purchase of standard text-books and all necessary steps have been taken to purchase more copies of standard text-books as early as possible.

दुर्दिन

वासुदेव सेन गुप्त—द्वितीय वर्ष, विज्ञान

जेठ का एक सवेरा। चारो ओर सूर्य का प्रकाश !! गांव से शहर को एक रास्ता—उसके किनारे एक मकान। सूर्य का प्रकाश खिड़की के राह एक कमरे में पंहुच रहा था।

कमरे के एक कोने पर एक चारपाई पड़ी है। उस पर कमलाकान्त सोया हुआ है। आज पन्द्रह रोज बाद ज्वर नही है। चारपाई पर आंख बन्द कर लेटे-लेटे सोच रहा है—अपने भाग्य पर—अपनी गरीबी पर—और सोच रहा है मातृहीन कान्ता और ६ वर्ष के लल्लू के बारे।

लल्लू कमलाकान्त के पास आकर खड़ा हो गया, पर उसे कुछ भी पता न चला।

लल्लु ने धीरे से पुकारा "बापूजो।"

कमलाकान्त मानो चमक उठा, पूछा, "कौन ? लल्लु ! क्या है बेटा ?"

"बापू, मुझे भुख लगी है।"

"दीदी से मांग कर खा क्यों नही लेता, बेटा ?"

"दीदी देती नहीं है। जरा डाँट दो न, जिससे जल्दी कुछ दे। मुझे बड़ी भूख लगी है।"

"जा, दीदी को बुला ला।"

* * * *

इसी बीच कान्ता लज्जा शरम त्याग अपने परोसिन रामेश्वर प्रसाद जी की स्त्री कमला देवी के घर थोड़ासा आटा और दाल लेने गई। वह जानती थी कि एक दिन कमला देवी उसकी माता का घोर शत्रु थी। पर वह क्या करती, गरीबी ने उसे वहां जाने को मजबूर किया।

कमला देवी रोटी पकारही थी। अचानक पैरों की आहट पाकर पूछी "कौन ?"

कान्ता कुछ शरमा कर बोली "मैं कान्ता हूँ मौसी।"

कान्ता का नाम सुनते ही मानो कमला देवी के शरीर में आग भड़क उठी। वह जरा तेजी के साथ पूछी, "क्यों ? क्या काम हैं।"

कान्ता और भी शरमा गइ। धीरे से बोली, "मौसी मैं तुम्हारे पास कुछ काम से आई हूं।" कुछ ठहरके फिर बोली, "बतलाने मे तो शरम लागती है। पर मजबूरन मुझे बतलानाही पड़ेगा।"

कमलादेवी इसबार और रुठकर बोली, "फिर बतलाती क्यों नही ?"

अबके कान्ता धीरे से बोली, "मौसी तुम्हे मालूम ही होगा कि आज पन्द्रह रोज से पिता जी बीमार हैं। इन दिनो वे काम पर न जा सके। जो कुछ रुपया पैसा था, सब उनके दवा-दारु मे ही खर्च हो चुका।" यह बोलते बोलते उसकी आंखो से आंसू बहने लगे। अपने आंचल से आंसु पोछती हुई फिर बोली "कल से घर मे खाने को एक दाना नही। लल्लु सबेरे से खाने के लिये रो रहा है। इसलिये मै— कान्ता रुक गई।

We congratulate our ex-student Mr Batakrishna Banarji, B L, H M B, F.R.E.S. (London) on the award of the title of Rai Sahib on him on the occasion of King Emperor's birth day. He has already been honoured by the award of a Medal by H. E. the Governor of Bengal in 1943 in recognition of his valuable honorary services under the Public Relations Committee In recognition of his services, St. John Ambulance Association has awarded him a VOTE OF THANKS certificate signed by LORD WAVELL, the Viceroy, as its president.

In pre-rationing days Mr. Banarji fought hard with the authorities to straighten matter and successfully organised the food distribution scheme in Ward No. 27. He was unanimously elected as Secretary to the Food Executive Officer, Tollygunge Sub Area. In the matter of Civil Defence his opinions and methods were highly valued by members of the Civil service as well as Congress leaders and they all have placed their opinions on record.

He was, in the year 1932, the Editor of our College Patrika and Vice-president of Students' Union too. He was the Organising Secretary of the All-Bengal Teachers' Conference held at Hetampur (Birbhum) in 1939 and delivered speeches on that occasion on Library Movement. His contributions to the science of Homeopathy have found place in the Journal of the All-Bengal Homeopathic Board "THE PROGRESS", which was highly spoken of by American authorities on medical science.

We wish him further progress and success in life.

Rai Sahib B. K. Banarji

ASUTOSH COLLEGE

Photo by—
Chhatrapati Sircar,
4th Year Science

कमलाकान्त तीन मील चल बहुत थक गया था। जब वह शहर के भीतर घुसा उस समय ८॥ बज चले थे कारखाने में पहुंचते पहुंचते १० बज गये।

कारखाने में पंहुचते ही कमलाकान्त अपने काम में लग गया। करीब ११ बजे से कमलाकान्त को ज्वर का अनुभव होने लगा। तबीयत मचलने लगी। कमलाकान्त उठा और मालिक के कमरे की ओर चला। कमरे में दिजेन्द्र बाबू के छोटे लड़के देवेन्द्र बाबू बैठे हुए थे। कमलाकान्त सीधा कमरे में घुसा और देवेन्द्र बाबू के टेबुल के सामने आकर खड़ा हो गया!

देवेन्द्र बाबू जरा नाराजी के साथ पूछे, "क्यों भई काम पर क्यों नहीं जाते? क्या तुम्हे नौकरी नही करनी है?"

"मालिक, मुझे बुखार आया है।"

"यहाँ खड़े क्या मुँह देख रहे हो। घर क्यों नहीं जाते?" कुछ अकड़ कर देवेन्द्र बाबू ने कहा।

हाथ जोड़ते हुए कमलाकान्त बोला, "मालिक कुछ मजूरी।"

"मजूरी! काहे की मजूरी? विना काम किये मजूरी। उँहूँ, मैं मजूरी नही दे सकता।"

कमलाकान्त को पैसो को जरुरत थी। बेचारा क्या करता? अपने काम पर लौट गया।

* * * *

कमलाकान्त के चले जाने से कान्ता को बहुत बुरा मालूम होने लगा। कुछ देर रोने के बाद रसोई में गई। जो कुछ बनपड़ा जल्दी जल्दी में पका लिया।

लल्लूने खाते खाते पूछा, "दीदी, तुम न खाओगी?"

"न भैया, अभी न खाऊंगी।"

"क्यों।"

"तूही बता भैया, मैं पिताजी को भूखा रख कैसे खा सकती हूं।"

"बापू कहाँ गये हैं दीदी?"

"काम पर।"

"तू उन्हे जाने से क्यों नहीं रोकी दीदी?" कान्ता चुप थी। आँखो से आँसू बह रहे थे।

"रोती क्यो है दीदी?" कुछ ठहर कर फिर बोला, "बताती क्यो नही?" कान्ता फिर भी चुप थी। "तू यदि न बताएगी, तो मैं न खाऊंगा।" लल्लू उठने लगा।

कन्ताने आँखों के आँसुओ को आँचल से पोछ डाला। लल्लू को हाथ पकड़ कर बैठाते हु येजरा हँसकर बोली, "कहां रोती हूं भैया? बैठ, बताती हूं।" फिर कुछ ठहर कर बोली, "बतला, यदि वे काम पर न जावे; तो हम सब क्या खावेंगे?"

"क्यों। रोटी दाल तो है न? मुझे तो अच्छा लगता है। शायद तुम्हे और बापू को अच्छा न लगता हो। यही न दीदी?"

कान्ता चुप थी। आँखों से लगातार आँसू बहने लगे।

* * * *

करीब दो बजे होंगे। दिजेन्द्र बाबू इधरही से निकल रहे थे। अचानक उनकी नजर कमलाकान्त पर जा पड़ी। कमलाकान्त के समीप पहुंच कर पूछे, "क्यों भाई कमलाकान्त? तुम्हे क्या हुआ है?"

"मालिक मुझे ज्वर आया है।"

दिजेन्द्र बाबू ने उसकी नाड़ी को स्पर्श किया। "उफ। काफी ज्वर है। अभी तक क्या कर रहे थे?"

लज्जा के कारण आगे बोला न जा रहा था। पर आज गरीबी ने बोलने के लिये वाध्य किया। वह फिर बोली "मैं तुम्हारे पास थोड़ा सा आटा और दाल लेने आई हूं।"

कोई कितना निष्ठुर क्यों न होता, कोई कितना पाषाण हृदय का क्यों न होता, पर उसे कान्ता के इन दर्द भरे शब्दों पर पिघलना ही पड़ता। कमला देवी को कान्ता पर दया आई। कान्ता की आंखो को अपने आँचल से पोछती हुई बोली, "मत रो बेटी, ये सब भगवान का खेल है।" फिर कान्ता को रसोई घर मे छोड़ दूसरे कमरे में गई। कुछ देर में कुछ आटा और दाल लेकर लौटी। कान्ता को लेने मे शरम मालूम हो रहीं थी। पर वह मजबूर थी।

* * * *

"दीदी, दीदी," पुकारता हुआ लल्लु रसोई की ओर दौड़ गया। पर कान्ता वहां न थी। कान्ता को न पाकर वह लौटने लगा। कान्ता आती दिखाई पड़ी। लल्लू दौड़ता हुआ कान्ता के पास पहुंचा। जरा अभिमान और गुस्से के साथ बोला। "तुम्हे बापूजी बुला रहें हैं।" कान्ता कारण पूछना चाहती थी। पर पूछने के पहले ही लल्लु उल्टे पैर भागता हुआ पिता के पास चल दिया।

कान्ता रसोई में सामान रख पिता के कमरे की ओर चली। कमरे में पहुंच लल्लु को पिता के पास पाई। पिता के चारपाई के नज़दीक पहुंच कर पूछी, "आपने बुलाया है पिताजी?"

"हां, बेटी।" कुछ ठहर कर फिर बोले, "लल्लू को अभी तक कुछ खाने क्यों नहीं दी बेटी?"

कान्ता को अपने अस्वस्थ्य पिता को यह बतलाने में शरम मालूम होने लगी कि घर में आज एक दाना नथा और वह अभी मांग क लाई है। वह जानती थी कि पिताजी के पता लगने पर वे एक क्षण बैठनेवाले नही हैं। वे अस्वस्थ्य शरीर ले काम पर जाएगें और कोई न कोई उपाय करेंगे।

कान्ता चुप थी। उससे कुछ बोला नही गया। आंखो से आंसू बह चले।

कमलाकान्त सब कुछ समझ गया। उसका दिल दहल उठा। उससे कुछ बोला नही गया। कुछ देर के लिये कमरे मे शान्ति छा गई।

कमलाकान्त कान्ता को अपने पास खींचते हुए बोला, "बेटी, मत रो, ये सब मेरी तकदीर है।" फिर लल्लू को अपनी ओर खींचते हुए बोला, "बेटा मैं अभी खाना लाये देता हूं।" यह कहकर कमलाकान्त उठने की कोशिश करने लगा।

उफ! आज उसे कितनी तकलीफ हो रही है। पैर उठना नहीं चाहते। आंखो के सामने अंधेरा छाने लगा। पर उसे जाना ही था। वह किसी प्रकार अपने को साम्हल उठ खड़ा हुआ और किसी के कुछ बोलने के पहले घर से बाहर हो गया। कुछ देर बाद कान्ता कुछ साम्हली। उसे अपनी भूल मालूम हुई। पिता को जानेसे क्यों न रोकी। वह दौड़ कर बाहर गई, पर अफशोष। कमलाकान्त आंखो के ओझल हो चुका था।

* * * *

"छोटे बाबू के पास गया था। उन्होंने छुट्टी तो देदी, पर मजदूरी मांगने पर, मजदूरी देने से इन्कार कर दिया।" कुछ रुककर फिर बोला, "कल शाम से घर में एक दाना नहीं, खरीदने को एक पैसा नहीं, बच्चे कल से भूखे पड़े है।" यह बोलते बोलते उसका दिल दहल उठा। आँखों मे आँसू आ गया। आगे कुछ न बोला गया।··· द्विजेन्द्र बाबू दयालु प्रकृति के व्यक्ति थे। जेब से ५) का एक नोट निकाले और कमलाकान्त को देते हुए बोले, "कुछ सामान खरीद, घर चले जाओ।"

*　　*　　*　　*

कमलाकान्त दुकान से कुछ चाँवल, दाल खरीद रास्ता तै करने लगा। गर्मी जोरों से पड़ रही थी। उसमें चलने की शक्ति अब न थी। पैर उठना नहीं चाहते थे। पर उसे चलना ही था। कोई बार मोटर तले आते आते बच गया।

कमलाकान्त अब शहर छोड़ चुका था। किसी प्रकार नदी के पुल तक पहुंचा। यहाँ से घर आध मील की दूरी पर था। चारो ओर शान्ति छाई हुई थी। नदी अपने मतवाली चाल से बह रही थी। सूर्य की किरणे उसके जलसे खेल-खेल रही थी। कमलाकान्त पुल तै कर रहा था। उसका पैर चलने से इन्कार कर रहा था। आँखोके सामने अंधेरा छाने लगा। कमलाकान्त के लिये अब चलना मुशकिल हो गया।

"छप" चारो ओर की शान्ति को भंग करती हुई एक आवाज आई। कुछ पानी उथल-पुथल हुआ। क्षण भर मे फिर वही शान्ति छा गई। मानो कुछ हुआ ही नहीं।

*　　*　　*　　*

कान्ता और लल्लू दरवाजे पर पिताकी बाट जोह रहे है। उन्हे अब भी पता नही कि उनके पिता अब इस लोक मे नहीं हैं। यह इनकी भूल नही, यह तो भगवान की भूल है। जिसने बिना इत्तला दिये ही इन गरीब बच्चे के पिता को छीन लिया है।

"दीदी, बापू तो अब भी नही आये।

"नही तो आये। शायद कोई काम के वजह रुक गये होंगे।" कान्ता बोलती-बोलती उठकर अन्दर चली गई।

कुछ देर के बाद लल्लू जोर से चिल्लाने लगा, "दीदी ! दीदी !!"

कान्ता भीतर से आती हुई पूछी "क्या है रे लल्लू ?"

रास्ते की ओर इशारा करते हुए बोला, "ओ देखो, बापूजी !"

कान्ता को भी बहुत दूर मे कोई आता दिखाई दिया। कान्ता का मन प्रफुल्लित हो उठा। लल्लू मरुस्थल के हरिण के माफिक मीरीचिका के पीछे दौड़ चला।

कान्ता और लल्लू के मुँह पर उदासीनता छाई हुई थी। लल्लू, कान्ता के मुह की ओर ताकता हुआ बोला, "दीदी, चलो न जरा नदी की ओर चले। शयद बापू उधर से आते हुए मिलेगें।"

"चलो !!"

नदी बह रही थी। पूर्व के क्षितिज में सूर्य डूब चला था। चारो ओर सूर्य की लालिमा फैली हुई थी। दल-दल में पंछीयाँ अपने घोंसलों को लौट रहे थे। इस निरवता के बीच लल्लू और कान्ता खड़े थे। उनकी आँखें पुलके दूसरे छोर पर गड़ी हुई थी।

संध्या हो चली। पूर्वसे चन्द्रमा का आगमन हुआ। पर हाय!! इन गरीबों के पिता का आगमन फिर कब होगा ?

—ः समाप्त ः—

ASUTOSH COLLEGE
ESTD. 1916
LIBRARY

Cover designed by
Sj. Monoranjan Das

Published by
Sj. J. N. Chakrabarty
9, Russa Road

Printed by
Sj. Bijoy Kumar Ray
at the Bhowanipore Press
39, Asutosh Mukherjee Road
Calcutta 25